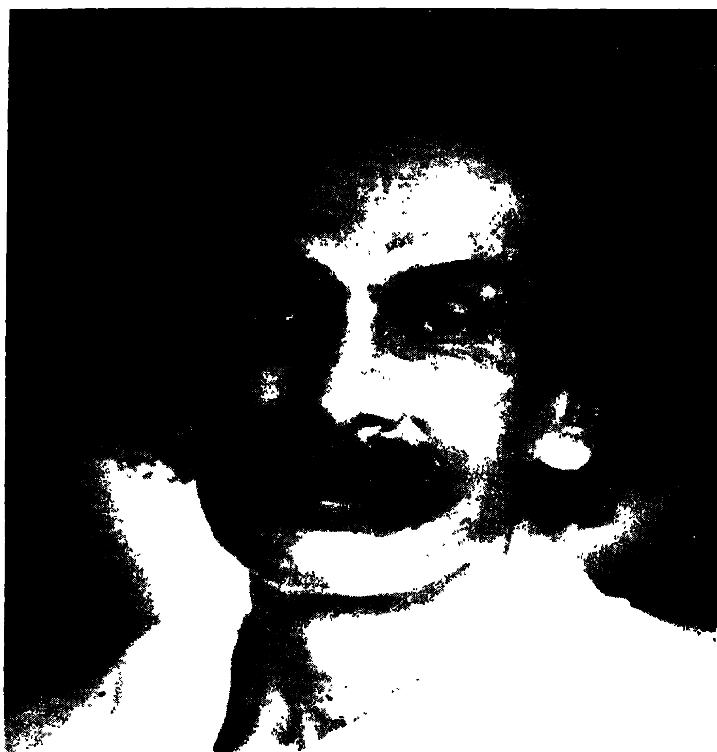


কবির্মনীষী

১৯৫৯

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

কলিকাতা - ১২

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারী : ১৯৫৯
পৌষ : ১৩৬৫

প্রকাশক : শ্রীহিমাংশুকুমার নিয়োগী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদশিল্পী : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ৩'৫০

প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ নূতন—সম্প্রতি লেখা অর্থাৎ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই : 'কবি সুধীন্দ্রনাথ' আর 'শেক্সপীয়রিয়ানা'। অন্যগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যথা, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'উত্তরা', 'বর্তিকা'। পুনঃপ্রকাশের জন্য এই পত্রিকা ক'খানির নিকট লেখক ঋণী রইলেন।

পণ্ডিচেরী
১৩ই জানুয়ারী
১৯৫৯

কবির্মনীষী

দেবজন্ম ও এসকিলস্

গ্রীক পুরাণে একটা বিচিত্র ঘটনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—দেবতাদের সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাধান্যপরম্পরা। শেষবার যিনি দেবরাজ হলেন, তিনি স্বনামবিখ্যাত জিউস বা জুপিতর। কিন্তু তিনি সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাঁর পিতা ক্রনস্‌কে বিতাড়িত করে; এই ক্রনস্‌ও আবার রাজপদে উঠেছিলেন তাঁর পিতা ইউরেনস্‌কে বিচ্যুত করে। এ যেন রাজত্বের জন্য উত্তরাধিকারীদের বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব (war of succession)—মানব-ইতিহাসে এ ব্যাপারটি একান্ত পরিচিত, প্রাচ্যে হোক আর পাশ্চাত্যে হোক।

অনেকে বলবেন—পুরাতত্ত্ববিদেরা বলে থাকেন—এর মধ্যে আশ্চর্যের বা রহস্যের কিছু নাই। ভগবানকে, দেবতাকে মানুষ গড়েছে নিজের আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে—স্বর্গ পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে যা ঘটে তা মানবীয় ইতিবৃত্তেরই আলেখ্য বা অনুবৃত্তি। মানুষের কল্পনা মানুষের স্বভাবকে ত ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কথাটি কি তবে এই শুধু?

কারণ, আর-একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটু অভিনিবেশ করে দেখলে, ধরা যায় না কি শুধু পারম্পর্য নয় কিন্তু পরিণামে একটা ক্রমোন্নতি? ঐতিহ্যে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'টাইটান' (দানব বা অসুর) -দের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ। আদিদেবতাদের অন্য নামই ছিল বৈদিক ভাষায় অসুর অর্থাৎ শক্তিমান। কিন্তু গ্রীকেরা যেসব শক্তিমানদের কথা বলেছেন তাঁরা পৌরাণিক অর্থে অসুর—তারা হল 'কাম এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ' এই বৃত্তির প্রতিমূর্তি। এদের স্বভাবে চরিত্রে যে রূঢ়তা যে ক্রূরতা তা স্পষ্ট। ক্রনস্ এবং তাঁর ভ্রাতৃকুল হলেন এইসব টাইটান। এক দিকে তাঁরা স্বর্গের (ইউরেনস্) সন্তান, তাঁদের মা হলেন কিন্তু পৃথিবী ('গেয়া' বা 'গে')—মাটির, জড়ের চেতনায় বা অবচেতনায় তাঁরা ঢালাই হয়েছেন বলেই তাঁরা হলেন একটা অধঃপতনের প্রতীক। দ্রষ্টব্য, তাঁরা সংখ্যায় বারো, ছয়টি পুত্র, ছয়টি কন্যা—সৃষ্টির ছয়টি স্তরের বা লোকের সত্তা ও

শক্তি অর্থাৎ সত্তা ও শক্তির অপচ্ছায়া? স্বর্গ হতে যে তাঁদের বিদায় হয়েছিল, ইউরেনস্ যে তাদের নির্বাসিত করে দিয়েছিলেন রসাতলের গর্ভে, তার হেতু তাদের অদেবী প্রকৃতি।

আদিদেবতার তিরোভাব, অসুরের দানবের আবির্ভাব, অমৃতত্বের পরিবর্তে মৃত্যু-বিষের জারণ সৃষ্টির মূলে একটা গূঢ় ইতিহাস— ইউরেনস্-এর পরিবর্তে ক্রনস্। কিন্তু অন্ধকারের গর্ভে জ্বলল আলো— তার প্রথম শিখা নিয়ে দাঁড়াল জিউস অলিম্পস্-পাহাড়ের চূড়ায়। জিউসের ভ্রাতৃকুল যে দেবগোষ্ঠী গঠন করেছে তা জ্যোতির্ময় হাস্যময়; তাদের পূর্ববর্তীদের তামসী প্রকৃতি কাটিয়ে তারা পেয়েছে এনেছে একটা জ্ঞানের সৌন্দর্যের সুষমশক্তির প্রভাব, যা হল গ্রীক বা হেলেনিক শিক্ষাদীক্ষার দান।

২

দেবতার নবজন্ম— এই রহস্যটি গ্রীক নাট্যকার এসকিলস্ তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে কথঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করেছেন। এসকিলীয় নাট্যাবলির মূল সূত্র যদি বলি জিউস-রহস্য অর্থাৎ দেবরাজ জিউস হলেন তাঁর নাট্যজগতে প্রধান ব্যক্তি বা নায়ক— তাঁরই প্রভাব বা ছায়া ছেয়ে আছে এসকিলীয় রঙ্গাঙ্গনে (যেমন বলা হয়ে থাকে, অশরীরী সীজর ছেয়ে আছে শেক্সপীয়রের সীজর নাটক), তবে তা অত্যুক্তি হবে না। কথাটি এখন একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

গ্রীক চেতনার একটা মূল বৈশিষ্ট্য হল নিয়তির, একটা অকাট্য নিয়তির বোধ— আমরা যেমন বলে থাকি 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। সৃষ্টির একটা ধারা আছে, গতি আছ, নিয়ম আছে (nomoi); সেই নিয়মই হল নিয়তি (Moirae)। অর্থাৎ মানুষকে জীবকে সেই নিয়ম পালন করতে হয়, সেই ধর্ম অনুসরণ করতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে; এ হল দিব্য বিধি, মানুষের গড়া তা নয়, চিরকাল তা ছিল, আছে, থাকবে— এই ত সনাতন ধর্ম। একে যে পালন করে সে পুণ্যবান, স্বর্গে তার স্থান; যে পালন করে না সে ব্যভিচারী, পাপী। পাপের ফল জীবনে দুঃখ কষ্ট নির্যাতন, পরিণামে নরক-ভোগ। এরই নাম কর্মফল (anangke, ATE)। কর্মফলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না— কর্মের কুম্ভীপাকে পুরোপুরি ঘুরতেই হবে।

গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস তাঁর ইডিপস্‌-কাহিনীতে নিষ্করুণ কর্মগতির আলেখ্য দিয়েছেন, ট্রাজেডির চরম কারুণ্য দেখিয়েছেন।

কর্মবন্ধ, কঠোর নিয়তি এক দিকে নিষ্করুণ নির্মম— পৃথিবীর তুচ্ছ আকুতি তাকে স্পর্শ করে না— আধুনিক এক কবির কথায়— Beyond the little voice that prays; আকস্মিক করুণা তার বিধানকে ভেঙে দিতে, টলাতে পারে না, হিউগো বলেছেন। কারণ অন্য দিকে, তাই ত হল নিরপেক্ষতা, সমদৃষ্টি, ঔচিত্য, যথান্যায় (DIKE, Justice)। এখানে এই ন্যায়ের তন্ত্রে, আমরা পূর্বতন মনোভাব থেকে একটা ভিন্ন উচ্চতর চেতনায় যেন উঠে গিয়েছি। অসুর বা টাইটানদের— জিউসের পিতৃপুরুষদের— ছিল স্বৈরেচ্ছার স্বেচ্ছাচার অর্থাৎ অনিয়মের জগৎ। বলেছি যে প্রকৃতির পরিচয় 'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং'— কিংবা 'অহঙ্কারং বলং দর্পং'— তাই হল এই রাজত্বের বা শাসনের প্রতিষ্ঠা। এই অরাজক স্বৈরাচারের (TURANNIS, tyranny) পরিবর্তে এখন এল নিয়তির বা কর্মের দৃঢ়বন্ধন— শুধু মানুষ কেন দেবতাদের (অসুরদের) পর্যন্ত মানতে হয়, ভোগ করতে হয় কর্মফল। কারণ তাই হল যথাবিধান, তাই ন্যায্যতা। আর জিউসই এই বিধানের ধর্তা, তিনিই ন্যায়াধীশ।

এর পরে, এবং উপরেও কথা আছে অবশ্য। কর্মবন্ধের নিয়তির ন্যায্যতার বাইরে, তার উর্ধ্বে হল যে তত্ত্ব ও সত্য তার নাম ভগবৎকৃপা বা করুণা। তার সঙ্গে মানুষী চেতনার পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। কর্মচক্রকে কেটে দিতে পারে এমন রহস্যময়ী শক্তি আছে, তাকে আবাহন করা যেতে পারে, কর্মজালের মধ্যে তাকে নামিয়ে আনা যেতে পারে এবং তার আশ্রয়ে জীব মুক্ত হয়ে উদ্ধার হয়ে যেতে অর্থাৎ উন্নীত হতে পারে উর্ধ্বতর বৃহত্তর স্বাচ্ছন্দ্যের লোকে। এই যে কারুণ্যশক্তি বা ভগবৎপ্রসাদ এক হিসাবে তা আবার অহেতুক— হেতু হয়ত আছে, কিন্তু সে তার নিজের মধ্যে, তার নিজের অসীম শাশ্বত গতির ছন্দে। তবে জীব সে অনির্বচনীয়ের পথ সুগম করতে পারে তার দিক থেকে প্রণিপাত, প্রপত্তি, শরণাগতির সহায়ে।

প্রথম পর্বে হল তবে পাপকর্মের ফল দণ্ডভোগ। ব্যভিচার বা নিয়মভঙ্গের পরিণাম শাস্তি অব্যর্থভাবে (গ্রীকরা এই প্রবৃত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তির স্বরূপ দেখাতে গিয়ে তার নাম দিয়েছে হুব্রিস্‌, Hubris)। প্রমেথেউস পাহাড়ের

উপরে গাঁথা পড়লেন, এনসেলাডস্ এটনা-আগ্নেয়গিরির তলে চাপা পড়লেন। কিন্তু প্রশান্ত মনে, বিদ্রোহ ঘোষণা না করে যদি দণ্ড গ্রহণ করা যায়, যদি তাকে স্বীকার করা যায়, সহ্য করা যায়—ন্যায়ের ধারা ব'লে, যেমন রাজা ইডিপস করেছিলেন—তবে তার স্বরূপ বদলে যায়, তার নাম হয় প্রায়শ্চিত্ত এবং তা সংশোধনের বা পরিশুদ্ধির পর্যায়ে উঠে দাঁড়ায়। কঠোর কর্মবন্ধনের ফলে—এমন কি যাকে বলে 'উৎকট কর্ম', যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই এবং যার ফল আশু এবং অবশ্যম্ভাবী, তার নির্বন্ধেও, শাস্তিভোগকে যদি প্রায়শ্চিত্তে পরিণত করা যায়, তবে পূর্বতর কর্মধারার প্রতিষেধ, এমন কি বিলোপ পর্যন্ত করা যায়—নরক হয়ে ওঠে Purgatory, অর্থাৎ পৌঁছে যাই স্বর্গের দুয়ারে। তখন যদি ভগবৎকরুণা এসে দেখা দেয় (যেমন বেয়াত্রিস্ এসেছিলেন দান্তের কাছে) তবে পুরাতন কর্ম, নরক সত্যই অবলুপ্ত হয়ে যায়, দেখা দেয় নন্দনের পরিশুদ্ধি ও আনন্দ। গ্রীক পুরাণে কর্মফলের প্রেতমূর্তি, পাপের শাস্তিদূত হল বিকটদর্শনা Erinyes—তারা অপকর্মের প্রতিক্রিয়া—এ হল justice without mercy; কিন্তু অপকর্ম প্রায়শ্চিত্তে বা চেতনা-পরিবর্তনে বা ভগবৎকরুণায় রূপান্তরিত হয় যদি সুকর্মে তবে তারাই হয়ে ওঠে সুদর্শনা Eumenides.

৩

এসকিলসের বৈশিষ্ট্য এই যে জিউসকে তিনি কেবল দণ্ডবিধাতা নয়, ন্যায়াধীশরূপে অধিষ্ঠিত করেছেন—এবং যথাসম্ভব ন্যায়ের সঙ্গে করুণারও স্থান করে দিয়েছেন। আমি যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলেছি সেই চেতনা তাঁর আবহাওয়া—তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে উঠে যান নি, তবে সেদিকের একটা দরজা বা জানালা খোলা এ রকম অনুভব করি। খৃস্টীয় করুণা তাঁর মধ্যে আমরা আশা করি না, সোক্রাতেস বা প্লেটোর স্নিগ্ধ সৌভ্রাত্র কিছু পাই বই কি।

আমি বলেছি আদিযুগের দেবতা (বা অসুর, টাইটান) ছিল শক্তি বা বলের প্রেতমূর্তি, অবিমিশ্র কেবল বল—ঘোরকর্মা তারা, অবাধ 'অয়মহং ভোঃ' এই তাদের মন্ত্র। তামস প্রাণপ্রবেগের মধ্যে এসে দেখা দিল একটু আলো, একটু জ্ঞান, একটু প্রীতি—জিউস এলেন সেই চেতনার প্রতিভূ হয়ে, তাঁর অলিম্পীয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

এসকিলসের জিউস তাই শুধু বজ্রধারী দণ্ডবিধাতা নন— তিনি আবার পরিত্রাতা, সহৃদয় অতিথি-বৎসল। তাঁর সান্ত্বনাদায়ী স্পর্শের যাদু এসকিলস্ বলছেন কি অপরূপ :

যে হাতের শক্তি দুঃখের অতীত, যে স্পর্শ তুরীয়ের নিঃশ্বাস হতে,
তাই দিয়ে তিনি মুছে দিলেন আর্ত মেয়েটির সব যন্ত্রণা।[১]

এই কোরাসটিতেই জিউসের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কি নূতন একটা জিনিস এসকিলস্ এনে দিয়েছেন তাঁর জিউসের পরিকল্পনায়— তা হল মিস্টিকদের, ভারতীয় ঋষি বা অধ্যাত্মসাধকদেরই মূল তথ্য। এসকিলসের এই বিখ্যাত কোরাস্ বলছে :

কোন দেবতাকে আবাহন করব আমি (গ্রীক Tin' an thēon... kekloiman স্মরণ করিয়ে দেয় বৈদিক 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম')— জিউস জনয়িতা— আপন হস্তে এই বিশ্বকানন রোপণ করেছেন যিনি —মানবজাতির নেতা— পুরাণী প্রজ্ঞা— মহান শিল্পী বিশ্বশিল্প-স্বর্গের জিউস্ :

তাঁর উপরে আর কারো আসন নাই— নীচেকার কারো হস্তের দণ্ড তাঁর উপরে অধিকার রাখে না। তাঁর বাক্যই কর্ম, অবিলম্বে সম্পাদন করে চলে তাঁর মানসে যা রয়েছে।

এসকিলস্ বাস্তবিকই দিয়েছেন বৈদান্তিক ভগবানের চিত্র। পরে বলছি আরো। জিউসের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন— তৎকালে প্রচলিত ধারণা ছিল তাঁর সম্বন্ধে যে, তিনি শুধু কবি অর্থাৎ কাব্য-রচয়িতা নন, তিনি ছিলেন আবার প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টা। এখানে কবি দেখিয়েছেন যে, জিউস আর আসুরিক দেবরাজ মাত্র নন— তাঁর বিধান তাঁর কেবল অহংকৃত-খেয়াল-প্রসূত নয়। প্রথমতঃ তিনি বিধানমাত্র নন, কেবল অকাট্য নিয়তি তিনি নন— পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে যে ভগবান কাঁদেন তা তিনি নন। বিধানমুক্ত, বিধানের উপরে তিনি স্বরাট্ ; আমাদের দেশে যেমন বলা হয় ব্রহ্ম হলেন নিত্যমুক্ত চৈতন্য। এই স্বাতন্ত্র্য কেবল জিউসেরই

১ By the painless strength of His hand, by the touch of His Breath Supernal, the pangs of her sickness ceased. . . . *The Suppliants.* মেহদি ইমাম -কৃত অনুবাদ।

আছে— কারণ তাঁর আছে সেই জ্ঞান, সেই চেতনা, পুরাণী প্রজ্ঞা (palaiphrōn), আর কারো নাই। আর কারো থাকলে তা হয়ে পড়ে আসুর-স্বৈরাচার। জিউসের স্বৈরেচ্ছা ব্যক্তিগত অনিয়ন্ত্রিত যদৃচ্ছা নয়, পদাকাঙ্ক্ষা ক্ষমতাস্পৃহা নয়— যেমন তাঁর পূর্বগামী পিতৃপুরুষদের ছিল ; এর প্রতিষ্ঠা বা প্রকৃতি হল EUNOIA (ইংরাজীতে বলে good will, kindness— কিন্তু ঠিক হল সংস্কৃতে যাকে বলা হয় সৌমনস্য) এবং Dike (ন্যায় বা justice -এর চেয়ে কিছু বেশি)। জিউসের একটা দিক বিধান বটে, কিন্তু তা একান্ত যন্ত্রবৎ নির্মম বিধান নয় জড়নিয়তির মতো। তাই বলা হয় তাঁর রাজত্ব নৈরাজ্য (অরাজকতা) যেমন নয়, তেমনি আবার স্বৈররাজ্যও (despotism) নয়— তা হল ধর্মরাজ্য (eunomia)। তিনি বিধানের উপরে, মুক্ত তিনি, এক তিনিই।[২] এমন কি জন্মেও তিনি মুক্ত, কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি, তিনি স্বয়ম্ভূ ; আপনার জনক আপনি তিনি, নিজেকে সৃষ্টি করলেন— তার অর্থ জগৎও সৃষ্টি হয়ে গেল সেই সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই মুক্ত নন কেবল, তিনি আবার মুক্তিদাতা— তাঁর পথে তাঁর চেতনার ধারায় চলে যারা তারাও মুক্ত হয়ে যায়— তিনি সকলের সকল বন্ধন খুলে দেন।[৩]

জিউসের মধ্যে তাঁর শক্তি ও তাঁর জ্ঞান কি রকমে একীভূত একাত্মতা লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে জ্ঞানের মধ্যে কর্তব্য উদ্ভাসিত হয়, তার পর তিনি তাকে কৃতকর্মে পরিণত করেন, তা ঠিক নয়— তাঁর জ্ঞানের স্বভাবই কর্মে পরিণত হওয়া তৎক্ষণাৎ, জ্ঞান কর্মশক্তিই, আমরা যাকে বলি চিৎশক্তি প্রায় সেই বস্তু। তিনি স্বরাট এবং সম্রাট।

Zeus-এর শত নাম। এক দিকে তিনি যেমন বজ্রধারী শত্রু-নিসূদন বা সর্বকর্তা সর্বসাধয়িতা (Zeus panteleis, pankrateis), অন্য দিকে তিনি পরিত্রাতা, সন্তাপহর্তা, আনন্দদাতা, তিনি খুলে দেন আমাদের দিব্যচক্ষু। একটা অরাজকতার শাসনের পরে তিনি এনে দিয়েছেন সুনিয়মের শাসন, ক্রূরতার বিধানের পরিবর্তে এনে দিলেন একটা সৌমনস্য, মাত্রাধিক্যের উৎকটতার পরিবর্তে ধরে দিলেন মিতাচার, সামঞ্জস্যের আদর্শ। মানুষের

২ Since none but Zeus is free—*Prometheus Bound* (Murray).
৩ The liberating ways that are God's—*The Suppliants*.

উপকার করেছে বলে প্রমেথিউসকে যে জিউস নির্মম শাস্তি দিতে চেয়েছেন তা নয়, তার মূল কারণ এ কাজ সে করেছে বিদ্রোহের অঙ্গ হিসাবে, আসুরিক মনোভাবে প্রবুদ্ধ হয়ে। এখানে তাই জিউসের রুদ্রমূর্তি। কিন্তু তাঁর দক্ষিণামূর্তি তিনি দেখিয়েছেন যখন প্রমেথিউস নতি স্বীকার করেছে —দুঃখের বিষয় এসকিলসের সে নাটকখানি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি (*Prometheus Unbound*)।

আমরা জিউস-এর যে চিত্র দিলাম সে হল তাঁর অলক্ষ্য অধ্যাত্মমূর্তি, যাকে বলা হয়েছে স্বর্গীয় জিউস (Ourios Zeus)। কারণ কবি নিজেই বলেছেন জিউসের দুই মূর্তি— তার একটি হল সাধারণ লৌকিক বা মানুষী মূর্তি— যেটা গল্পে কাহিনীতে লোকসমাজে প্রচলিত। ফলতঃ সব দেবতারই আছে এই দুই রূপ। বাহ্য রূপকে মানুষ গড়েছে যতখানি সম্ভব মানুষভাবে, পার্থিব ক'রে— কিন্তু আন্তর রূপ হল দেবতার দিব্য স্বরূপ। মনে হয় এসকিলস্ কথঞ্চিৎ তার সন্ধান পেয়েছিলেন।

৪

দেবতার ক্রমপরিণামের কথা উল্লেখ করেছি গোড়ায়। গ্রীসীয় দেবরাজের বংশপরম্পরা তারই ইতিহাস কিছু দেয় বলেছি। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, হেলেনিক শিক্ষাদীক্ষা মানবচেতনার যে পরম পরিণতি প্রকাশ করে ধরেছে, তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এই অলিম্পীয় অধিরাজ জিউস। কিন্তু মানবচেতনার শেষ চরম পরিণামে আমরা ত এখনো পৌঁছাই নি। জিউসই যে শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ অধিরাজ নন গ্রীক ইতিবৃত্ত, স্বয়ং এসকিলস্ই এ তথ্য এনে দিয়েছেন। জিউস একটা পরম্পরায় এসেছেন যেমন, তেমনি চলেও যাবেন আর-একজন বৃহত্তর বা মহত্তর দেবরাজের স্থান করে দিয়ে। ভাবী মানব-চেতনার প্রতীক হয়ে উঠবেন আর-এক ইন্দ্র। এ সম্বন্ধে ইংরেজ কবি শেলীর কি স্বপ্ন তা আমি অন্যত্র আলোচনা করছি।

প্রাচীনতমেরাও নবীনতমের মতোই একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকার উষা অতীতের উষা-পরম্পরায় শেষ উষা, কিন্তু আজকার উষাই আবার ভবিষ্যপরম্পরায় প্রথম।

'প্রমেথিউস্'-কাহিনী

গ্রীক দেবতারা বিচিত্র—গ্রীকদের কথা বলি কেন, ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা, কি দেবতা মাত্রই, যে দেশের হোক না, সকলেরই লীলা প্রায় এক রকম। তা মানুষেরই মতন, সময়ে সময়ে মানুষেরও অধম—মানুষের যে-সব হীনতর প্রাকৃত প্রবৃত্তি তাই দিয়েই যেন গড়া দেবতাদের স্বভাব। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অক্ষমতা কি কম দিয়েছে দেবতাদের পরিচয়? প্লেটো তাই কবিদের উপর এত বিরূপ ছিলেন (যদিও তাঁর নিজের ছিল এক গভীর নিবিড় কবি-প্রকৃতি)—হোমর এত বড় কবি, দেবতাদের কি প্রকৃতি দিয়েছেন তিনি?

প্রাচীন গ্রীসের প্রবীণতম নাট্যকার এসকিলস্ তাঁর সুবিখ্যাত 'শৃঙ্খলিত প্রমেথিউস্'[১] নাট্যে পাঠকদের ব্যাখ্যাকারদের কাছে অনুরূপ সমস্যা তুলেছেন। সমস্যা এই, প্রমেথিউস্ নিজে দেবতা, কিন্তু দেবরাজ জিউস তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন—কারণ প্রমেথিউস্ মর্ত্যমানুষের সাহায্য করেছে, মানুষকে আগুন এনে দিয়েছে; মানুষ আগে আগুন বস্তুটিকে চিনত না জানত না, প্রমেথিউস্ই মানুষকে এই আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে সংস্কৃত মার্জিত শক্তিমান করে তুলেছে। পৃথিবীর নশ্বর জীবটির উপর তার বড় অনুরাগ। এই অনুরাগই

১ ইংরেজীতে আমরা বলি 'প্রমিথিউস্', 'এসকিলস্'—অনেকটা গ্রীক শব্দের ও উচ্চারণের কাছাকাছি। তবে গ্রীক ও লাতিন ভাষায় অন্তস্থ এই অস্, উস্ হল সংস্কৃতের বিসর্গ (অস্ ভাগান্ত যাকে বলে)। ফরাসীরা তাই বোধ হয় অত্যন্ত ন্যায়সংগতভাবে এই প্রত্যয়টি পরিত্যাগ করেছে। তারা 'প্রমেথিউস্' (প্রমেথেউস্) না বলে বলবে 'প্রমেতে', থ উচ্চারণ তারা করতে পারে না, 'এসকিলস্' (গ্রীক আইস্খুলস্) না বলে সরাসরি বলবে 'এসিল' (Eschyle)। সাফোক্লিজ, ইউরিপিদিজ, হেরোডোটস্ না বলে বলবে সোফোক্ল, ইউরিপিদ, হেরোদোত্। বাংলায় আমরা কি করব? ফরাসীর অনুকরণে বাংলায় আমি লিখেছিলাম এক সময়ে সোফোকলা, ইউরিপিদ, এসকিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বোধ হয় প্রমেথিউস্কে 'প্রমাথী' করেছিলেন সর্বপ্রথম। ইংরেজীতে বলি আমরা প্লেটো, গ্রীকে তা প্লাতোন, ফরাসীরা বানিয়েছে প্লার্তে। বাংলায় আমি করতে চেয়েছিলাম 'প্লাতন'। হিন্দীতে আরবীর অনুসরণে প্লেটোকে বলা হয় ইফ্‌লাতুঁ, আর অ্যারিস্টটলকে আরিস্তুঁ। আর আলেকজান্দের যে সিকন্দর তা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু ইংরেজীর প্রভাব এত স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে আমাদের উপর যে ইংরেজী ধ্বনি একটু শ্রুতিকঠোর হলেও, পরিচিত বন্ধু যেন হয়ে উঠেছে। তবে ইংরেজীতেও বলি হোমার (হোমর), গ্রীকে যদিও তা 'হোমেরস্', ফরাসীতে হোমের। সমস্যাটি এখনও বিচারাধীন রাখা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

জিউসের আবার বিরাগের কারণ। জিউস মানুষকে দেখতে পারেন না। এ কি ব্যাপার? দেবরাজ যিনি— যাঁর কাছে আশা করি মহত্ত্ব ঔদার্য দিব্যদৃষ্টি, তাঁর এ কি ক্ষুদ্রতা? কথাটা তা হলে বুঝি একটু।

প্রমেথিউস্-কাহিনী একটা সুপ্রাচীন পৌরাণিক গল্প। কিন্তু পৌরাণিক গল্প আজকাল আর নিছক গল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তার মধ্যে দেখা হয় সেকালের মানুষের প্রকৃতি স্বভাবচরিত্র আর তার সমাজের আলেখ্য বা ইতিকথা। তাছাড়া অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে এসব কাহিনী একটা রূপক, তার পিছনে রয়েছে মানুষের বাহ্যজীবনের ইতিহাস নয়, তার অন্তরের অভিজ্ঞতার, একটা নিগূঢ় জ্ঞানের চিত্র। Mythology এক দিকে history হয়ত, কিন্তু আরো সত্যতরভাবে হল mystery— কি রকম? বৈদিক সরস্বতী শুধু একটা নদী নয়, তা ছিল আবার সত্যজ্ঞানের ধারা (সুনৃতানাং চোদয়িত্রী)। শুনঃশেফ তিনটি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যূপকাষ্ঠে, বরুণদেবের কৃপায় তাঁর মুক্তি হল— এ কেবল যজ্ঞীয় গল্প বা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়— এর গভীরতর অর্থ তাছে। মর্ত্যমানুষ, মনোময় জীব আবদ্ধ নিম্নপ্রকৃতির কঠোর বন্ধনে। প্রকৃতির তিনটি পাশ— দেহ, প্রাণ আর মন। বরুণ হল বৃহৎ চেতনা— মানসাতীত বৃহত্ত্বের উপলব্ধিই মানুষকে এনে দিল মুক্তি। এই হল শুনঃশেফ-কাহিনীর মর্মকথা।

আমাদের বিশ্বাস জিউস প্রমেথিউস্ -কাহিনীর পিছনেও রয়েছে একটা অনুরূপ আন্তর তত্ত্বকথা। বলি সে কথা, তবে আমাদের মত অর্থাৎ আধুনিক মনের মত ক'রে। মানুষ আগে গোড়ায় আগুন বা অগ্নি কি বস্তু জানত না — স্বর্গ হতে তাকে নামিয়ে আনল প্রমেথিউস্। অগ্নি স্বর্গের জিনিস— অগ্নির যে বীর্য যে জ্যোতি তা স্বর্গীয়, তা কেবল দেবভোগ্য। দেবতারা দেবতা— জ্যোতির্ময় বীর্যময়— কারণ তাঁরা অগ্নিময়। আমরা বেদের আদিমন্ত্র স্মরণ করতে পারি এখানে— অগ্নিমীলে পুরোহিতং দেবম্— অগ্নিকে পূজা করি, দেবতা যিনি রয়েছেন সকলের পুরোভাগে। প্রথমেই তাই প্রশ্ন ওঠে মানুষকে এ জিনিস দেওয়া কেন? গ্রীক কবি সেই প্রশ্ন তুলেছেন— ভারতীয় কবি বা ঋষি কোনো আপত্তি তোলেন নি; ব্যাপারটিকে সহজ সত্য বলে গ্রহণ করে তার নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করেছেন। অগ্নি যদি মানুষের অধিকারে আসে, তবে দেবতা-মানুষে কোনো পার্থক্য থাকবে না, মানুষ হয়ে উঠবে দেবতা।

আমাদের বৈদিক ঋষির সেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বলেছি আপত্তি করাও চলতে পারে— একটা বিপদের বিভ্রাটের সম্ভাবনাও আছে। সেই দিকটাই গ্রীক কাব্যে ও নাট্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা প্রাচ্যে বিশেষ-ভাবে বলেছি দেবাসুর-সংঘর্ষের কথা, ওরা পাশ্চাত্যে বলেছে দেবতা-মানুষে সংঘর্ষের কথা। প্রথমতঃ গ্রীকদের ধারণা ছিল, সৃষ্টির কতকগুলি মূল নিয়ম, বিধি বা ধর্ম আছে (nomoi)— তা লঙ্ঘন করলে হয় প্রত্যবায়, মহাপাপ ; ফলভোগ করতে হয় নিদারুণ। এ হল যেন উৎকট কর্ম এবং তার উৎকট ফল। নিয়তি হলেন দেবী আনাঙ্কে (Anangke— অনিবার্যতা), আর তাঁর দণ্ডবিধাত্রী সাঙ্গোপাঙ্গ এটী (Ate), এরীনিয়েস (Erinyes)। দেবতার ধর্ম ও নিয়তি এক, মানুষের ধর্ম ও নিয়তি ভিন্ন। প্রমেথিউস্ চেয়েছে দুটির মিশ্রণ— অর্থাৎ আমরা যাকে বলি বা এক যুগে যাকে বলা হত 'বর্ণসঙ্কর', যার ফল সমাজের সৃষ্টির উৎসাদন, ধ্বংসসাধন।

কারণ আরো নিবিড়ভাবে একটু দেখলে আমরা বুঝতে পারি এবং যাঁরা চক্ষুষ্মান্ তাঁরা বলে থাকেন— মানুষকে দেবত্বের গুণ গ্রহণ ও ধারণ করতে হলে তার অধিকারী হওয়া চাই, অর্থাৎ চাই স্বভাবের পরিমার্জনা, প্রকৃতির একটা পরিশুদ্ধি। মানুষ হল ক্ষুদ্র-চেতন, জরামৃত্যুর দাস, সে কি রকমে অমরত্বের ভার গ্রহণ করতে পারে? সে ভার চাপিয়ে দিলে তার উপকার হবে না, সে ভেঙেচুরে পড়বে। প্রমেথিউসের আগুন নিয়ে মানুষ আজ কি খেলছে? মানুষ আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে— চলেছে না কি আত্মবিলোপের পথে?

উপনিষদের সাধক নচিকেতা অগ্নিবিদ্যা চেয়েছিলেন, কিন্তু তা অধিগত করবার জন্য তাঁকে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছিল, একটা শিক্ষা বা সাধনা বা তপস্যার ধারা অনুসরণ করতে হয়েছিল। ঋষিরা বলতেন অপক্ব ভাণ্ডে তীব্র সোমরস রাখা যায় না— ভেঙে যায়, গলে যায়। মাটির পাত্র— মানুষ মাটির পাত্র বই কি— তাকে পুড়িয়ে শক্ত সমর্থ করতে হয় আগে।

কিন্তু প্রমেথিউস্ কি করলেন? তিনি কোন বাছবিচার করলেন না— উপকার করবার আবেগে, যাকে বলা হয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, তা করলেন না, যদিও তাঁর নামের অর্থ 'অগ্রবিবেচক'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল— তোমার এ দুর্দশা কেন, তুমি কি পাপ করেছিলে যে দেবরাজ তোমার উপর

এমন রুষ্ট ? তিনি বললেন, মানুষকে তিনি আগুন এনে দিয়েছিলেন তাই—বুদ্ধির আগুন, মানসিক চাতুর্যের আগুন, হাতের শাণিত কৌশল—যার ফলে শিল্পকলা, শিক্ষাসভ্যতা মানুষের। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আর কি করেছিলেন ? আগুন এনে দিয়েছিলেন কি রকম ব্যবস্থার মধ্যে ? চার দিকে শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে ! কি রকম ? মানুষের দৃষ্টি হরণ করলেন—দৃষ্টি থাকলে মানুষ হয়ত ভয় পাবে, কি নির্জীব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, এই রকম ধারণায়। সাক্ষাৎজ্ঞানের পরিবর্তে অন্ধ আশা ! অন্ধ আশা আর প্রাণে আগুন—এই ত সহজ মানুষ ; এইভাবে ধূমাচ্ছন্ন অগ্নি মানুষের বুকে প্রজ্জ্বলিত হল। কিন্তু উচিত ছিল না কি আগে মানুষের অন্তর-বেদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, প্রশান্ত নির্মল করা, অগ্নি সমিদ্ধ হলে যাতে ক্রমে ধূমশূন্য হয়ে বিশুদ্ধ ঔজ্জ্বল্যে, জ্যোতির্ময় তেজে পরিণত হয় ?

ফল হল তাই বিপরীত। প্রমেথিউস্ ভাঙলেন সনাতন অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম, লঙ্ঘন করলেন বিধির লিপি। তাই তিনি নিয়ে এলেন যথাবিহিত চয়ন করা ঔপনিষদিক অগ্নিদেব নয়, কিন্তু পাথিব আসুর আগুন—একটা খাণ্ডব-দাহন, তাতে নিজে দগ্ধীভূত হলেন, বিশ্বও হল দগ্ধীভূত। এসকিলস্ এইভাবে দেখালেন উৎকট কর্মফল—poetic justice।

তবে বলা বাহুল্য, এতখানি তত্ত্ব ভেবেচিন্তে যে এসকিলস্ তাঁর গল্পটি রচনা করেছেন তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু গল্পটির অন্তরালে এই রকম একটা উপলব্ধি আগে হতেই ছিল বা এই রকম একটা উপলব্ধিকে মূলতঃ আশ্রয় করে গল্পটি প্রথম রূপ গ্রহণ করে—এ অনুমান আমরা করতে পারি—পরে কথাটি শাখা-প্রশাখায় পত্রে-পল্লবে অলংকৃত, বিভূষিত পরিবর্তিত হয়ে বিশাল কাহিনীরূপে দেখা দিয়েছে। আমি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি অন্তরের সূক্ষ্ম সূত্রটি।

সে যা হোক—প্রমেথিউসের দিক থেকে তাঁর কর্মের পক্ষে যে সদ্‌যুক্তি নেই তাও আবার নয়। আমরা বলেছি মাটির পাত্র পুড়িয়ে শুষ্ক করা শক্ত করা দরকার—তার জন্যে ত আগুনের দরকার আগেই। কিন্তু এ জবাব হল আধুনিক মনের। এসকিলস্ তাঁর আর-একখানি নাটকে বন্দী প্রমেথিউস্‌কে মুক্ত করেছেন—কিন্তু সে নাটকটি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে তার মূল ভাবটা অনুমান করা হয়েছে। প্রমেথিউস্

মুক্তি পেল, স্বেচ্ছায় শেষে জিউসের অনুগত হয়ে। কিন্তু এ পরিণাম আধুনিক মনের অনুমোদিত নয়। প্রমাণ ইংরেজ কবি শেলী।

২

প্রমেথিউসের কথা বলতে গিয়ে শেলীর নাম না করলে চলে না। এই ইংরেজ কবি এসকিলসের অভাব পূরণ করে দিয়েছেন, অবশ্য তাঁর নিজের ভঙ্গিতে। শেলীর 'শৃঙ্খলমুক্ত প্রমেথিউস্' বিখ্যাত নাটক এবং অনেক হিসাবে একখানি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এখানে যে আশার আস্পৃহার দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন কাব্যগত চমৎকারিত্বের সঙ্গে, তাতে আরো এই ভারতীয় সিদ্ধান্তটির প্রমাণ হয় যে, কবি আর ঋষির মধ্যে নিবিড় মিল রয়েছে কোথাও— যদিও সনাতনী মতে শেলীকে পাষণ্ডের দলে (Satanic poets) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শেলীর পাষণ্ডত্ব অর্থ আধুনিকত্ব। এসকিলস্ যে দৃষ্টি দিয়ে দেবতাদের দেখেছেন, জিয়ুসকে প্রমেথিউস্‌কে চিত্রিত করেছেন, শেলীর কাছে তা আশা করতে পারি না। দেবতা বা জিউস অর্থ তাঁর কাছে অত্যাচার উৎপীড়ন, প্রাচীনের প্রভুত্বপ্রিয়তা। আর প্রমেথিউস্ হল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে মুক্তির স্বাতন্ত্র্যের শান্তির প্রেমের বিগ্রহ। পাষণ্ডেরা— আধুনিকেরা— অনেক সময়ে দেখি পুরাতন পরিচিত সংজ্ঞাগুলির অর্থ বদলে, উল্টে দিয়েছেন। তাঁদের মতে দেবতাই অসুর, আর অসুরই হল দেবতা। এই রকম একটা রুচিবৈপরীত্য মিস্টিক কবি ব্লেক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন— স্বর্গ হয়েছে নরক আর নরক হয়েছে স্বর্গ।

পুরাতন-সনাতন-বিরোধী, সংস্কার-প্রয়াসী প্রাণ-প্রবেগ মনের মধ্যে এই রকম একটা মূল্য-বিপর্যয় ঘটায়। ধার্মিক আস্তিক কবি মিলটন পর্যন্ত এই রকম প্রভাবের হাত থেকে উদ্ধার পান নি— তাঁর কবিপ্রাণ শয়তানকে যতখানি জীবন্ত, সহানুভূতিযোগ্য করে ধরেছে, কোনো এঞ্জেল, এমন কি ভগবান স্বয়ং, সে আনুকূল্য লাভ করেন নি। আমাদের মধুসূদনে মেঘনাদ প্রমীলা বা রাবণ যে সত্য ও সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে, রামসীতা তার কাছে ম্লান হয়ে পড়ে নি ?

যা হোক আমি বলছিলাম দেবতার বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। দেবতা ভগবানকে কল্পনা করা হয় এইভাবে যে তাঁরা রয়েছেন ঊর্ধ্বে,

স্বর্গে. এখানকার দুঃখ দৈন্য মালিন্য তাঁদের স্পর্শ করে না—তাঁরা আনন্দ করেন, মজা করেন মর্ত্যজীবের শোক কষ্ট দেখে, দেখে শুধু নয় আবার, শোক কষ্ট দিয়ে। এ হেন দৈব বা দানবীয় শক্তির অনুগত কোনো বীরহৃদয় হতে পারে না—তার একমাত্র ব্রত বিদ্রোহ।

আমি চিরবিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !…
আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !

প্রমেথিউস্ এই বিদ্রোহী বীর। সে নিজেই শেষে ভেঙে চুরমার হয় কি না, সে খেয়াল তার নেই।

সৃষ্টির একটা নিয়মই কি এই ? অত্যাচারী শাসকের, একচ্ছত্র প্রভুর বরাবর থাকবে বংশ-পরম্পরা কি যুগ-পরম্পরা, আর তার বিরুদ্ধে থাকবে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ-পরম্পরা ? প্রমেথিউস্ দাঁড়ালেন যাঁর বিরুদ্ধে তিনি হলেন জিউস (মনু-শাসিত এক-এক মন্বন্তরের কল্পনা ভারতবর্ষে করা হয়েছে—তবে বলা চলতে পারে সে কল্পনা যথাসম্ভব সাত্ত্বিক প্রকৃতির)। এই জিউস নিজেও তাঁর পিতা ক্রনস্‌কে (Cronos) পদচ্যুত করে তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন। এই ক্রনস্‌ও আবার ছিলেন তাঁর পিতা— আউরানস্-এর (Ouranos) বিদ্রোহী পুত্র। এ ধরণের জীবকে আধুনিক চিত্ত যে দেবতা বলে মেনে নিতে, পূজা করতে পারেন নি, তা স্বাভাবিক।

এই রকম প্রভু বা বিধাতার কবলে পড়ে পৃথিবী হয়েছে নরক অর্থাৎ অজ্ঞানের স্বার্থপরতার ক্রূরতার রাজ্য, সকল রকম দীনতার হীনতার পীঠস্থান। পৃথিবীর এ রকম থাকা চলবে না, তাকে হতে হবে স্বর্গভূমি। মানুষকে তার সব রকম কায়িক মানসিক দৈন্য দূর করে হতে হবে জ্যোতির্ময় জীব। মানুষ বদলে যাবে, তার দেহ হবে সুন্দর, তার মন হবে সুন্দর, তার প্রাণ হবে সুন্দর— সে হবে সৌন্দর্যময়। এমন কি স্থূল প্রকৃতি অবধি— নদনদী, প্রান্তর-পর্বত, তরুলতা— সব নূতন একটা জীবনে সজীব হয়ে উঠবে। সব হবে প্রেমের প্রীতির আলোর আনন্দের প্রকাশ। এই হল শেলীর স্বপ্ন।

এ কাজ সংসাধিত হবে প্রমেথিউসের আত্মদানে ও আত্মসিদ্ধিতে। কে এই প্রমেথিউস্ ? শুধুই তিনি বিদ্রোহী ধ্বংসকারী নন,— আসলে তিনি

একজন স্রষ্টা। প্রমাথী হলেন অগ্নিধারী, অগ্নিবাহক। বাহ্য অগ্নি বটে— যে অগ্নি অরণি-মন্থনের ফল— যার দান হল যন্ত্রপাতি এবং মানুষের সভ্যতা। কিন্তু বাহ্য অগ্নি একটা আন্তর অগ্নির বিগ্রহ বা প্রতীক— তা হল চিন্ময় অগ্নি, ঊর্ধ্বগতির ক্রমারোহণের আস্পৃহার অগ্নি। এ অগ্নির আদিনিবাস উত্তরলোকে, দেবধামে, তুরীয় চেতনায় (তুরীয় অর্থ চতুর্থ—দেহ, প্রাণ আর মনের ওপারে)। তবুও পৃথিবীর সঙ্গে এর নিবিড় সম্বন্ধ। প্রমেথিউস্ দেবতা বটে, কিন্তু তাঁর মা হলেন পৃথিবী (হয়ত এর অর্থ অতিচেতনায় অন্তর্নিহিত যে পৃথিবী বা ক্ষিতিতত্ত্ব, আর তার গর্ভস্থ শক্তিই হল অগ্নি)।

তাই পার্থিব জীব মানুষ তাঁর সহোদর। এই জন্যই মানুষের উপর তাঁর আকর্ষণ। মানুষকে তিনি যে অগ্নি-সম্পদ দিতে চান তাও স্বাভাবিক।

অগ্নির শিখায় ভর করে মানুষকে ঊর্ধ্বে উঠে চলতে হবে, তার চেতনাকে প্রকৃতিকে সমুন্নত সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, মানুষকে তেজোময়, জ্যোতির্ময় এবং আনন্দময় হতে হবে। কিন্তু উঠতে হবে বাধা ভেদ করে। বাধা হল অতীত নিয়মের ব্যবস্থার অত্যাচার, গতানুগতিকের উৎপীড়ন— রবীন্দ্রনাথ যার সুন্দর নাম দিয়েছেন 'অচলায়তন'। এক গভীর অর্থে কেবল অতীত নয়, ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ঊর্ধ্বস্থ দেবলোক পর্যন্ত এই অচলায়তন। কি রকম? দেবতারাও হলেন এক-একটি অহং। তাঁরাও এই হিসাবে অসুরই—ঊর্ধ্বতর স্তরের অসুর। বৈদিক দেবতাদের একটি বিশেষণই হল অসুর, যদিও তার অর্থ হল বীর্যবান্ (কথাটির ব্যুৎপত্তি অসু+র; অ+সুর নয়)। প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ ধর্মকর্মের বিগ্রহ। দেবতারা যেখানে ভগবানের সচ্চিদানন্দের একান্ত অঙ্গীভূত সেখানকার কথা আলাদা। কিন্তু নিম্নতর লোকে দেবতারা গ্রহণ করেছে স্ব-স্ব-প্রধান মূর্তি। এইসব স্বর্গলোকে— মৃত্যু-দেবতা নচিকেতাকে যেখানকার লোভ দেখিয়েছিলেন— অপরিবর্তনীয় বিধান। সেখানে উন্নতি নেই, অবনতিও নেই। প্রত্যেকে এক-একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর সিদ্ধি। কিন্তু মানুষ পরিবর্তনশীল, তার উন্নতির সীমা নেই, তার গতির সীমা নেই। যত অতলে পড়ে থাক্, ঊর্ধ্বে উঠবার ক্ষমতা তার আছে; যত উচলে উঠে যাক, আরো উঠে যাবার সম্ভাবনা তার আছে। তাই এমনও বলা হয় ভারতীয় শাস্ত্রে যে, দেবতারা যদি চায় মুক্তি তবে তাদেরও মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

ঊর্ধ্বে যে দেবতারা নিজের কোট বজায় রাখতে আগ্রহশীল, তাঁদের রাজা মানুষের মত চিরগতিমান্ চঞ্চল বিদ্রোহীকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন না। শেলী এই লড়াইয়ের দিকটা এবং তার পরিণাম মানুষের জয় দেখিয়েছেন যে চিত্র বা রূপকের আশ্রয়ে তার মধ্যে একটা নিগূঢ় তত্ত্বের ছায়া লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিতই হই— বলতে ইচ্ছা হয় কবি তিনি, ঋষি হতে হতে থেমে গিয়েছেন।

দেবলোক মানুষ অধিকার করবে কি রকমে? অন্য কথায় দেব-পতির পতন ঘটবে কি উপায়ে? দেব-পতির পতনে হবে প্রমেথিউসের মুক্তি। প্রমেথিউসের মুক্তি অর্থ মানুষের নব সৃষ্টি— পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য। দেবপতির পতন হবে দেবপতির আপন সন্তানের হাতে— যেমন পূর্বাপর ঘটে এসেছে, নূতনের বীজ পুরাতনের মধ্যেই। পুরাতন স্বর্গের মধ্যে নূতনের বীজ উপ্ত হল— জিউস্ উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন সমুদ্রতনয়া বারুণী থেটিস্-এর সঙ্গে। এই সমুদ্র ও সমুদ্রতনয়াকে আমরা ঐহিক বা স্থূল ভৌতিক আবেষ্টনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। ঊর্ধ্বের ও নিম্নের, স্বর্গের ও মর্ত্যের উদ্বাহেই ত নবতর সৃষ্টি। কিন্তু শেলী এখানে গভীরতর গুরুতর একটি রহস্যের কথা বলেছেন। তাঁর ডেমোগরগন (Demogorgon) তত্ত্ব। দেবলোকের ঊর্ধ্বে যে ভবিষ্য-জীব বা সত্তা জন্মাল তাকে ত রূপ গ্রহণ করতে হবে, স্থূলদেহ ধারণ করতে হবে, নতুবা পৃথিবীর রাজত্ব তার কি রকমে হবে? আর সে রূপ সে দেহ এমন হওয়া চাই যা শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য অভেদ্য— ঠিক আত্মারই মত হবে অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ং। কোথায় সে উপকরণ? শেলী তা পেয়েছেন ডেমোগরগন-এর কাছে। ডেমোগরগন অর্থ 'মহৎ যক্ষ', ঔপনিষদিক ভাষায়— ডাইমোন+গরগন [২] (গ্রীকে গরগন অর্থ বৃহৎ বিপুল মহৎ আর ডাইমোন অর্থ অলৌকিক সত্তা, দেবশক্তি ইত্যাদি)। এই যক্ষের স্থান পৃথিবীর অন্তর-গহ্বরে, অতলে পাতালে। সেখান থেকে উঠে সে চলবে ঊর্ধ্বে স্বর্গে জিউসের লোকে। আমি ব্যাখ্যা দিই, ডেমোগরগন মহৎ যক্ষ হল অচেতনা বা অবচেতনা, সৃষ্টির স্থূল প্রকাশের প্রতিষ্ঠা যা, যাকে ধরেই মূর্ত সব এখানে। এ হল স্বয়ং প্রকৃতি—স্থূল প্রকৃতির

২ কোনো কোনো টীকাকার বলছেন ডেমস+গরগন=বৃহৎ+জন বা লোকসংঘ। কিন্তু এখানে ডেমো মনে হয় 'ডাইমো'র অপভ্রংশ।

নিজস্ব শক্তি, জড়ের মধ্যে নিহিত লুক্কায়িত যে চিন্ময় শক্তি। মানুষ যে এতদিন দাসত্ব করে এসেছে, সে যে আপনার মুক্তি সাধন করতে পারে নি, পৃথিবী যে দৈন্যের দুঃখের পীড়ার অজ্ঞানের পাপের আধার হয়ে আছে, তার কারণ মানুষ খুঁজে পায় নি, আহরণ করে নি, প্রয়োগ করে নি এই তার অবচেতন শক্তিকে, যা হল লৌকিক বা প্রকট প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাশক্তি। এরই একটু কণা বা ছায়ার আভাস পেয়েছে জড়বিজ্ঞান্ আজ, যখন সে আবিষ্কার করেছে এই তথ্য যে জড়কণা জমাট শক্তি বা তেজ ছাড়া আর কিছু নয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং গুহ্যবিদ্যা বলছে ঊর্ধ্বতমকে পূর্ণ আবির্ভূত করা যেতে পারে এই এখানে, নিম্নতমের পূর্ণ প্রকটনে ও ঊর্ধ্বায়নে। দার্শনিকের ভাষায় বলব, জড় যেমন হল স্থির শক্তি, অচেতন (বা অচিৎ) হল আবার তেমনি অবচেতন মাত্র— অর্থাৎ চেতনার (চিৎশক্তির) সংবৃতি, আত্মসংহরণ, বা আত্মসংহৃতি। পৃথিবী যদি স্বর্গ না হয়ে থাকে, তার কারণ পৃথিবীকে আমরা সংস্কার করতে চেয়েছি মনের বুদ্ধির শক্তি দিয়ে— মনের বুদ্ধির শক্তি অতি সীমাবদ্ধ, তার সামর্থ্য নেই মানুষের স্বভাবকে জগৎ-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে পারে। সে সামর্থ্য এক আছে পৃথিবীর নিজস্ব শক্তির, পৃথিবীর দেহাভ্যন্তরে নিমজ্জিত যে মহৎ যক্ষ তার। এই পার্থিব সন্তান উঠে এসে পৌঁছাবে দেবলোকে, সেখানে যে দেবশিশু সঞ্জাত তাকে দেবে প্রকট রূপ, করবে শরীরী— এই অপরূপ সম্মিলনে গঠিত যে নবজীব নবসত্তা সে-ই জিউসের স্থান অধিকার করবে। পুরাতন বিধানকে পর্যুদস্ত করবে, যে বিধানকে বলা হত অলঙ্ঘ্য নিয়তি, যার স্থায়িত্ব নির্দেশ করা হত যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ তার পরিবর্তে আসবে নববিধান, সংঘর্ষের নয় মৈত্রীর, দ্বেষের নয় প্রেমের, অজ্ঞানের নয় আলোর সাম্রাজ্য— সেই নরদেবতাই পৃথিবীতে জিউসের দাসরাজ্যের পরিবর্তে স্থাপন করবে ধর্মরাজ্য, সত্যযুগ। ডেমোগরগনের এই হল অপূর্ব দৌত্য।

প্রমেথিউস্ তখন হবে নবস্রষ্টা। প্রমেথিউস্ অর্থ ভাবীদ্রষ্টা বা মন্তা (প্রো, পূর্ব হতে, মান্থানো, আমি মনন করি— সংস্কৃত মন্ ধাতু, যদিও মন্থ্ ধাতুর সঙ্গে একটা সাযুজ্যও থাকতে পারে)। সে হল মানুষের মধ্যে, শরীরের মধ্যে যে তেজোময় অন্তর্যামী প্রচ্ছন্ন, যাঁর দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে সুদূর ভবিষ্যতে, ভাবীসিদ্ধি সার্থকতার উদ্দেশ্যে, যিনি চলেছেন

চালিয়ে নিতে চেয়েছেন মানুষকে শরীরীকে। কিন্তু বর্তমানে এই শরীরের মধ্যে, বর্তমানের ব্যবস্থা মধ্যে তিনি ক্লিষ্ট নিপীড়িত। তিনি হলেন জড়ের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ জীবপুরুষের প্রথম প্রতিকৃতি— ক্রুশবদ্ধ খ্রীষ্টের আদি স্বরূপ। মানুষের মধ্যে ভগবানের আত্মাহুতি, মর্ত্যের মধ্যে অমৃতের মন্থন— তারই আলেখ্য এ, যাতে মানুষ ভগবান হয়ে ওঠে, মর্ত্য হয়ে ওঠে মূর্ত অমৃত।

বলেছি, এসকিলসের অবশ্য দৃষ্টি ছিল ভিন্ন, উদ্দেশ্যও ভিন্ন। তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন নি— সৃষ্টির ত্রুটিবিচ্যুতি, মানুষের সংস্কারস্পৃহা, এসব জিনিস আলোচনা করতে তিনি যান নি। তাঁর বিষয় ছিল 'ধর্মরাজ' বা 'সনাতন ধর্ম' অর্থাৎ যাকে মেনে নেওয়া সনাতন ধর্ম বলে তার মহিমা কীর্তন— যে অলিখিত বিধি সৃষ্টির ললাটে লিখিত।

কবি সফোক্লিজও ঠিক এই কথাই বলেছেন:

দেব-অনুশাসন অলিখিত অবিচল—
এ জিনিস আজকের নয়, কালকের নয়, রয়েছে চিরকাল,
কেউ জানে না কবে থেকে তা দেখা দিয়েছে।

—আন্তিগোনা

আমাদের ঋগ্‌বেদীয় ঋষি বলেছেন অনুরূপভাবে 'অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি' — বরুণদেবের অলঙ্ঘ্য বিধান— এই বরুণদেবের নিকটেই পাশমুক্তির প্রার্থনা করছেন শুনঃশেফ।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির— দেবতার ব্যক্তিত্ব হোক আর মানুষেরই হোক— ইচ্ছা বা বাসনা এই মহাবিধানকে ব্যাহত করে না টলায় না, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেই ব্যক্তিই চূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং বিজ্ঞতা হল তাকে মেনে নেওয়া, তার অনুগত হওয়া। তা ভালো কি মন্দ বিচার করবার অধিকার বা সামর্থ্য কোনো সৃষ্ট জীবের নেই। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব স্থান, বিশ্বব্যবস্থায় আছে স্থানের উপযোগী কর্ম, তাকেই বলে স্বাধিকার। স্বাধিকারে অপ্রমত্ত থাকা— মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনং—এই ছিল প্রাচীনের অনুশাসন। নিয়ম-শৃঙ্খলা, বাধ্যতা-আনুগত্য— কর্তা যিনি নেতা যিনি তাঁর ইচ্ছা বা বিধি অনুসারে। এই সত্যের ব্যাখ্যাতা এসকিলস্। এই সত্যটি জাজ্বল্যমান করে ধরবার জন্যেই কর্তা জিউসকে যেমন একান্ত অত্যাচারী করে দেখিয়েছেন, অন্য দিকে বিদ্রোহী প্রমেথিউস্‌কে তেমনি উগ্রতার পরাকাষ্ঠায় নিয়ে ধরেছেন।

আমাদের দেশেও এক যুগে এই রকম একটা সমস্যা যেন দেখা দিয়েছিল, বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল বলা উচিত, কারণ এ সমস্যা যুগে যুগে দেখা দেয়—শ্রীকৃষ্ণ যখন এলেন তাঁর যুগান্তকারী নববিধান নিয়ে। কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধ পুরাতনে আর নূতনে ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌতূহলের বিষয় আরো এই যে ভীষ্ম বা দ্রোণের মত জ্ঞানী বিজ্ঞ মহাপুরুষও ছিলেন সনাতনী—শ্রীকৃষ্ণকে জেনে মেনেও তাঁর পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কি নূতন জগৎ কি নববিধান নিয়ে এলেন তা আলোচনা করবার স্থান এখানে নেই, তার প্রয়োজনও নেই।

এসকিলস্ যে শিক্ষা দিয়েছেন তা এই— বিশ্বের বিধানকে যে মানে না তারই মহদ্‌ভয় মহতী বিনষ্টি ঘটে। দোষ বিধানের নয়, দোষ আপন কর্মের। কেউ কাকেও বিপদের মধ্যে ফেলে না, দেবরাজেরও ক্ষমতা নেই—প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় ফাঁদের মধ্যে পা দেয়, নিজের নিজের দুর্গতি ডেকে আনে। শেলী দেখিয়েছেন কিন্তু এই দুর্গতি থেকে একটা মুক্তির পথ।

মহামনীষী গ্যেটে

গ্যেটে মানুষী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতীক। সেই সংস্কৃতির পূর্ণতা যেমন তেমনি তার পরিণতি, অর্থাৎ তার অন্ত বা শেষও এই মনীষীর মধ্যে সাকার হয়েছে। গ্যেটে মানুষের সেই চেতনা, সেই চেতনার প্রবেগ যা চিরন্তন, চায় ক্রমগতি ক্রমবৃদ্ধি। ফলতঃ, জানবার আয়ত্ত করবার যা-কিছু থাকতে পারে, কৌতূহল ঔৎসুক্য স্পৃহা যত বহুল ও বিচিত্র হতে পারে, তাই নিয়েই ত মানুষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব। গ্যেটের সৃষ্ট ফাউস্ট এই পূর্ণ মানুষী মানুষ। গ্যেটে নিজেও দেখি একাধারে কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক— এমন বিষয় খুব অল্পই আছে যা তাঁর চেতনার পরিধির মধ্যে আসে নি এবং যার উপর তাঁর জ্ঞানপ্রভা প্রতিফলিত করে তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন নি। কর্মক্ষেত্রেও তিনি যে দক্ষতা দেখান নি তা নয়। রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসনেও তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ রয়েছে। এত বহুমুখী প্রতিভা এবং প্রতি ক্ষেত্রে এত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিভা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এক লেওনার্দো(Leonardo da Vinci)র কথা। তবে উভয়ের পার্থক্য রয়েছে, কোথায় তা পরে যথাস্থানে বলছি।

গ্রীক জাতি একটা সভ্যতার সূত্রপাত করেছিল, তার চরম এবং শেষও এই জর্মন মনীষীর মধ্যে। গ্রীকের হল মানস-প্রতিভা, বুদ্ধিগত সংস্কৃতি, বলেছি মানুষের 'মানুষী' প্রকৃতি। অফুরন্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, অফুরন্ত চলবার আকাঙ্ক্ষা— আমাদের বৈদিক ঋষিরা মানুষের যে বৃত্তিকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন এই অপূর্ব মন্ত্র 'চরৈবেতি', মানুষের অন্তরের অনির্বাণ আস্পৃহা, এই নিত্যসমিদ্ধ অগ্নি, তাই ত মানুষকে মানুষ করেছে, ইতর প্রাণীর চক্রগতির পর্যায় থেকে তাকে তুলে ধরেছে এই ঊর্ধ্বতর অগ্রগতির পর্যায়ে। মানুষের এই যে আস্পৃহা, গ্যেটে তার তিনটি মূল ধারা নির্দেশ করেছেন; গ্যেটের ফাউস্ট এই ধারাত্রয়ী, এই ত্রিস্রোতা দিয়ে গঠিত চরিত্র।

প্রথমতঃ মানস আলো, বুদ্ধির চিন্তার বিচার-বিতর্কের খেলা— বিশুদ্ধ জ্ঞানৈষণা। সব জিনিস নিয়ে আলোচনা, তাদের প্রকৃতি কি ধর্ম কি

কর্ম কি তার গবেষণা, বস্তুর আদি কি মধ্য কি অন্ত কি তার একটা মানচিত্র অঙ্কন—এইসব নিয়ে মস্তিষ্কের বৃত্তি; এই বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের ফলে মানুষ যে সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে, জীবজগতে প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। তবুও বলতে হবে, এই যে জ্ঞান তা বেশির ভাগ জিনিসের খোলসেরই পরিচয় দেয়, জিনিসের অন্তরের বার্তা এদিক দিয়ে মেলে না। একটা জগৎ রয়ে গেছে, জ্ঞানেরই বিষয় তা, কিন্তু মানস-আলোর বাহিরে তা, তর্কবুদ্ধি তাকে ধরতে পারে না। তা ছাড়া বিশুদ্ধ জ্ঞানৈষণা মানুষকে খণ্ডিত ক'রে ধরে, মস্তিষ্ককে বিপুল করে ধরে বটে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ হয় পঙ্গু। অনেক সময় দেখি অতিরিক্ত জ্ঞানের ফলে—'বহুনা শ্রুতেন'—যে অনুপাতে মানুষ বিদ্বান বা পণ্ডিত হয়ে উঠেছে সে অনুপাতে কর্মঠ, স্থূল জগতে দক্ষ সমর্থ হয়ে উঠতে পারে নি। মানুষের মধ্যে রয়েছে আর-একটি নিভৃত স্তর, তাতে দেয় সূক্ষ্মতর জ্ঞান কিন্তু সেই সঙ্গে নিবিড়তর প্রবলতর সামর্থ্য। এ হল গুহ্য বিদ্যার জগৎ, মানুষের চেতনার দ্বিতীয় ধারা। প্রথম ধারাকে যদি বলি জ্ঞান, এই দ্বিতীয় ধারাকে তবে বলব বিজ্ঞান। কারণ এটি হল বিশেষ বিবিধ ও বিপুল জ্ঞান। আর স্থূল বিজ্ঞানের মতই এ বিজ্ঞান দেয় জিনিসের কল-কব্জার খবর, জিনিস যে বলের চাপে চলে এবং যে নিয়ম অনুসরণ করে চলে তা আমরা জানি এই বিজ্ঞানের ফলে; জিনিসের উপর আমাদের কর্তৃত্বও আসে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জোরে। মনের বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া রয়েছে সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎবোধের জগৎ। পঞ্চভৌতিক প্রকৃতি আর তার অন্তর্গত যে জীবজন্তু যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তা হল অনন্তের স্থূল দেহ; কিন্তু এই স্থূলের পিছনে রয়েছে সূক্ষ্মভূত, যা হল বিশ্বের অন্তঃশরীর, যাতে রয়েছে গূঢ়তর গাঢ়তর শক্তিসব, যারাই অন্তরাল থেকে অনুপ্রাণিত করে পরিচালিত করে এই স্থূল-ভূতের জগৎ—স্থূল ত সূক্ষ্মের যন্ত্র বা বাহন মাত্র। আর এখানেই রয়েছে যাদের নাম দেওয়া হয় যক্ষ রক্ষ জিন দানা প্রেত পিশাচ দেবদানব পর্যন্ত। ফাউস্ট তাঁর বাহ্যজ্ঞানের জগৎ শেষ করে এগিয়ে চললেন আরো এই অন্দরমহলের শক্তিময় কিন্তু বিপদসঙ্কুল জগতের মধ্যে; বিপদসঙ্কুল, কারণ, অজানা অচেনা অন্য ধরণের এ জগৎ; তারপর এখানকার শক্তি শক্তিমান ত

বটেই, তাতে রয়েছে আবার বিস্ফোরকের আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতা, রয়েছে একটা অনিশ্চিত পরিণতি, কল্যাণের দিকে হোক কি অকল্যাণের দিকে। কিন্তু মানবচেতনা, মানুষের যাযাবর প্রবৃত্তি তাকে এখানেও থামতে দেয় না। বাহ্যজ্ঞান কেবল নয়, অন্তর বা গুহ্যবিজ্ঞানও নয়, মানুষকে সর্বাঙ্গ দিয়ে, দেহের আবেগ দিয়ে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে হবে— নতুবা পূর্ণ পূর্ণতা মানুষের লাভ হবে না। মানুষের ভোগায়তনেই ত রূপগ্রহণ করে মূর্ত হয়ে প্রকাশ পায় তার স্বভাবের সামর্থ্য ও সার্থকতা। সম্যক্ ভোগ ছাড়া জীবন নাই, জীবনের রসে জারিত নয় যে চেতনা তা শুষ্ক পত্রের মত, বড় জোর গ্রন্থপৃষ্ঠার মত; তাই ত কবি বলছেন (যদিও শয়তানের মুখ দিয়ে):

> Grey, my dear friend, is all theory,
> And green the golden tree of life.

ফাউস্টের জীবনে মার্গারেট-কাহিনী যে একটা সুন্দর কবিত্বময় করুণ শোভামাত্র তা নয়, এ হল দেহের মধ্যে কর্মায়তনে তার সমগ্র প্রাণধারার, তার অন্তর ও সূক্ষ্ম জীবনগতির মূর্ত প্রপাত। ফলতঃ এই ত সেই ক্ষেত্র, সেই রণাঙ্গন যেখানে হয় অন্তিম যুদ্ধ; শয়তানের হয় জয় কি পরাজয়, মানুষ হারায় কি পায় তার অন্তরাত্মা।

কারণ এখানেই মানুষের সাক্ষাৎপরিচয় তার মূল বাধাটির সঙ্গে। মানুষের যে প্রবেগ অগ্রগতির জন্যে, ঊর্ধ্বগতির জন্যে, সর্বব্যাপী গতির জন্যে, তা হল আসলে প্রচ্ছন্ন আত্মার ধর্ম, অন্তঃপুরুষের দান, ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত যে অঙ্গ যে স্তর বা অংশ সেখান হতে উৎসারিত। কিন্তু আর-একটা দিক আছে মানুষের— এবং প্রকৃতি ও জগতেরও— রক্ত-মাংসের কামনা, অন্ধলিপ্সার বুভুক্ষা, তামসপ্রবেগের খরধারা; ঊর্ধ্বের, আলোকের, প্রশান্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নাস্তিক এই অঙ্গ— মানুষকে তা টেনে নিয়ে চলে অধঃপতনের পথে, চিরন্তন নিরয়ের অতলে, শয়তানের আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে। এই যে চতুর্থ— বিপরীত অর্থে তুরীয়— অধস্তন পদ, শয়তান স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত সেখানে, তার সমস্ত আশা ভরসা মানুষের এই পদতলের রন্ধ্র দিয়ে অন্তরে প্রবেশ। এই যে দ্বন্দ্ব, নির্মম কঠোর, মনে হয় চিরন্তন— মানুষের জীবন দ্বিধাভিন্ন তাতে, প্রতি পদে ক্ষতবিক্ষত। তাই ত ফাউস্ট বলছে:

Two souls, alas, dwell in my breast···the one clings to the world···the other lifts itself···to the realms of an exalted ancestry.

এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা, এই দ্বৈতের হাত থেকে উদ্ধার কি ভাবে কোন্ দিকে? একবার যখন মানুষের দৃষ্টি ঔৎসুক্য গিয়ে পড়েছে বাহিরের দিকে, অধোদিকে যেমনি পা বাড়িয়েছে সে শয়তানের প্ররোচনায়, কি তার সঙ্গে সন্ধি করে, তেমনি তাকে যেন পিচ্ছিল পথে গিয়ে পড়তে হয়েছে, ক্রমে ঝড়ের বেগে ছুটতে হয়েছে অব্যর্থভাবে অসহায়ভাবে নিরালোকের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে, অজ্ঞানের অরাজকতার মধ্যে, মহতী বিনষ্টির মধ্যে (Walpurgis' Night)।

গ্যেটের মীমাংসা খৃস্টীয় মীমাংসা। মানুষ আপাদমস্তক কলুষিত, পাপ তার মেদমজ্জাগত। নিজের কৃতিত্বে কখনো নিজেকে সে উদ্ধার করতে পারে না। তার উদ্ধার সম্ভব ভগবৎপ্রসাদে। এটিকে আমরা তবে বলতে পারি সৃষ্টিরহস্যের পঞ্চম তত্ত্ব। শয়তান মানব-আত্মাকে প্রলুব্ধ করে তার রাজ্যের, নরকের দুয়ার অবধি নিয়ে এসেছে— নিয়তি কি? প্রবেশ করতে হবে কি হবে না? কর্মফল বলে প্রবেশ করতে হবে— শয়তানের নিজেরও বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা তাই, এমন কি আত্মারও শঙ্কা অন্য গতি তার বুঝি আর নাই।

তবে মানুষের একমাত্র পুণ্য বা সুকৃতি আছে; ভগবানকে ভালবাসা তার পক্ষে সহজ ও সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু সে মানুষকে ত ভালবাসতে পারে, মানুষী ভালবাসা দিয়েও সে যদি সত্যকার ভালবাসা উদ্রেক করতে পারে, তবে তার আর ভয় নাই। মানুষী প্রেমের সে অধিকার সে সামর্থ্য আছে মনে হয়, প্রাকৃত আত্মাকে নিরয়গমনোন্মুখকে উদ্ধার করতে পারে— শয়তানের হাত থেকে তাকে ছিনিয়েই নিতে পারে। যে কামনাবেগ নরকের দ্বার নামে লাঞ্ছিত, যাকে হাতিয়ার করে শয়তান মানুষকে নিজের সাথী করে টেনে নিয়ে চলেছে অব্যর্থ অধঃপতনের শেষ সীমায়— শেষ সীমায় দেখা গেল সেই বস্তুই হয়ে উঠেছে উদ্ধারিণী শক্তি। কি যাদুর বলে দোষ রূপান্তরিত হয়ে গেল গুণে।

ফাউস্টের প্রথম ভাগে যবনিকা পতন হল যেন একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়ে। প্রেমের সত্য সত্যই জয় হল কি? প্রেমিকাকে তবে স্পর্শ

করতে পারলে না নরকের রাজা, প্রেমিককেও নয়? রিক্ত হস্তে ফিরে গেল শয়তান? দ্বিতীয় ভাগে কবি মীমাংসাটা স্ফুট করে ধরলেন। মানুষ, মানুষের আত্মা নিরয়গামী হয় না শয়তানের জীবনব্যাপী যুগব্যাপী চেষ্টা সত্ত্বেও। যে মানুষ সত্য সত্যই ভালবেসেছে মানুষী ভালবাসা দিয়েই, সেই ভালবাসা তাকে রক্ষা করেছে নিভৃতে— ভালবাসা যে বেদনার জন্মদান করে, যে অশ্রুধারা উৎসারিত করে, তা সকল পাপ, সকল ত্রুটি ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে দেয় যেন (গ্রীক মতে ট্রাজেডির ধর্ম যা), অন্তর্হৃদয়ের অশ্রুলেখা বৈতরণী অতিক্রম করবার ক্ষমতা শয়তানের নেই। এক দিক দিয়ে প্রেম স্বর্গীয়, সর্বাবস্থায় সর্ব রূপে। মার্গারেট পার্থিব প্রেম, কিন্তু তার স্বর্গীয় প্রতিরূপ হেলেন। স্বর্গীয় প্রেম আর ভগবৎপ্রসাদ একই। সে এসে তার যাদুমন্ত্রে শয়তানের আসন্ন গ্রাস থেকে উদ্ধার করে নিলে মানব-আত্মাকে।

ফলতঃ গ্যেটের মতে শয়তান মূলতঃ ভগবানের বৈরী নয়, ভগবানের সমান একান্ত বিরোধী শক্তি নয়। শয়তানও ভগবানের ভৃত্য, এমন কি ভগবানেরই শক্তি, বলা যেতে পারে 'বামা শক্তি'। তার কাজ হল যেন আমাদের পুরাণে যাকে বলে শত্রুভাবে সাধনা— ভগবানের দিকে গতি যাতে হয় প্রবলতর তীব্রতর ক্ষিপ্রতর— প্রাকৃত জীবনের চরম, যাতে নবজীবনের আরম্ভ হয় নিঃসন্দেহে। শয়তান মানবাত্মাকে গ্রাস করছে ততখানি নয় যতখানি সে করে আত্মহত্যা হারাকিরি, সে নিজেই বলছে:

> I ascend the witch mountain for the last time; and because my own cask runs thick, the world also is come to the dregs.

ভগবানের উপর প্রীতি মানুষকে ভগবানের দিকে চালিয়ে নেয়; ঠিক তেমনি আবার সংসারের দুঃখাভিঘাতও তাকে অল্পের মধ্যে, দৈনন্দিন সুখের মধ্যে চিরকাল তৃপ্ত হয়ে থাকতে দেয় না। শয়তানের তাড়না, অঙ্কুশাঘাত মানুষকে থামতে দেয় না, তমোগ্রস্ত নিদ্রাভিভূত হতে দেয় না, ক্রমাগত তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। শয়তানকে ভগবান দিয়েছেন এই সদাজাগ্রত প্রহরীর কাজ।

গ্যেটে মানুষের দিয়েছেন ক্রমগতির, চিরন্তন যাত্রার অর্থাৎ চির-অতৃপ্তির ইতিহাস। মানুষ চায় আলো, আরো আলো— চায় শক্তি, আরো শক্তি—

চায় আনন্দ, আরো আনন্দ। মানুষ চায় অনন্তকে অধিকার করতে। কিন্তু কোথায়, কি রকমে এই চিরদীপ্ত আস্পৃহার হবে চরিতার্থতা, পরিপূর্ণতা? গ্যেটে চলেছেন সাধারণ মানুষের পথে, সাধারণ মানুষের চেতনা ও বৃত্তি নিয়ে— তার যতখানি প্রসার বা পরিস্ফূর্তি হতে পারে তাকে আশ্রয় ক'রে— তার অতিরিক্ত কিছু ধরে নয়। মানবীয় মানসিক চেতনা দিয়ে, তাকে ধরে যত দূর যত দিকে এগিয়ে চলা যায় এবং সে ভাবে যা-কিছু লভ্য কাম্য অধিগত করা যায়, গ্যেটে দিয়েছেন তার চিত্র। কিন্তু অনন্ত সান্তের যোগফল নয়, সান্ত থেকে সান্তে চলে চলে কখনো অনন্তে পৌঁছান যায় না, অনন্তকাল ধরেও নয়। অশেষ প্রয়াসের পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ফাউস্ট বলছে:

> Where shall I seize thee, Infinite Nature? Ye breasts, where?

প্রকৃতিকে অধিকার করবার, সমগ্রভাবে তাকে আলিঙ্গন করবার রহস্য কি? প্রকৃতির ঈশ্বর হতে হলে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে— মানুষী চেতনা অতিক্রম করে একটা অতিমানুষী চেতনা অর্জন করতে হবে। ফাউস্ট নিজেই তার এই অক্ষমতার কথা বলেছে, কি করুণভাবে:

> In vain have I scraped together and accumulated all the treasures···I am not a hair's breadth *higher*.

উপনিষদে বলছে দুটি বিদ্যার কথা, এক পরা আর-এক অপরা। গ্যেটে মগ্ন রয়েছেন অপরাকে নিয়ে, তাঁর প্রয়াস অপরাকে ধরে পরার দিকে বা পরার মধ্যে পৌঁছান। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অপরাকে জানতে হবে, জানতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু পরাবিদ্যার পথ ভিন্ন, ভঙ্গি ভিন্ন, তাকেও অধিকার করতে হবে, তবে তার ধারায় চলে। সে পরাবিদ্যা সাধারণ জ্ঞানে, তর্কবুদ্ধির মধ্যে নাই, তা বিজ্ঞান বা সূক্ষ্মভৌতিক বিদ্যার মধ্যেও নাই, তা নাই জীবনের বাস্তব কর্মে বা স্থূল উপভোগে।

গ্যেটে তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সে রহস্যভেদ করতে হয় যে পরারহস্যবিদ্যা দিয়ে তার সন্ধান ঠিক তাঁর মেলে নি। এই যে মানবীয় দেহ-প্রাণ-মন দিয়ে গড়া ঊর্ণনাভের জাল বা গুটিপোকার গুটি, তা কেটে বের হয়ে আসতে তিনি পারেন নি। জালকে টেনে টেনে বৃহদায়তন করে চলেছেন, গুটিকেও প্রসারিত বিপুল করে ধরেছেন, কিন্তু এ স্ফীতির নাম

আনন্ত্য নয়। এ স্ফীতির পরিণতি বিনষ্টি— mole ruat sua— নিজের ভারে নিজে ভেঙে পড়া। ফলতঃ গ্যেটে বলতে চান মানুষী জীবনের অব্যর্থ স্বাভাবিক পরিণামই একটা নিদারুণ ব্যর্থতা, গতির বেগ নিয়ে চলে শেষে এক পাষাণপ্রাচীরের উপর, যখন মনে হয় চূর্ণ মস্তিষ্ক ছাড়া আর গত্যন্তর নাই কিছু। অবস্থার যখন এই চরম তীব্রতা তখন ঘটে এক অঘটন— মানুষের উদ্ধার সেই এক পথে। অন্তিমে ভগবৎ-করুণার এক অহেতুক প্রকাশ, গ্যেটে একমাত্র এই আশ্বাসের উপর ভর করেছেন।

বলেছি, ভগবৎকরুণা গ্যেটের কাছে এসেছে প্রেম রূপে, নারীমূর্তি নিয়ে। খৃস্টীয় ধর্মসাধনায় মধ্যস্থ— Intermediary বা Paraclete-এর কথা আছে, মানবাত্মাকে ভগবানের কাছে পৌঁছে যে দেয়। মানুষ নিজে নিজের উদ্ধারসাধন করতে পারে না, ভগবানও রয়েছেন অতি দূরে তাঁর কূটস্থ পরম শুভ্রতার মধ্যে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেন মানুষের কাছে, মানুষেরও সে হয় দূত ও দিশারী। বেয়াত্রিস্ এইভাবে তার প্রেমিক দান্তেকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। গ্যেটেও বললেন সেই সনাতনী নারীশক্তির কথা, যার নিবিড় প্রেম তার ঐকান্তিক তীব্রতার জোরেই পুরুষকে উদ্ধার করলে প্রকৃতির প্রাকৃত কবল থেকে।

গ্যেটের মীমাংসায়— সাধারণতঃ সকল প্রপত্তির সাধনাতেই— দেখতে পাই মানুষী আস্পৃহা বা তৃষ্ণা আর ভগবৎকরুণা এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে একটা ফাঁক— কার্যকারণ দূরে থাক্, একটা সাজাত্যের সম্বন্ধও উভয়ের মধ্যে বুঝি নাই। ভগবৎকরুণা আকস্মিক অহেতুক, তা অঘটন ঘটায়, অপ্রত্যাশিতকে বাস্তব করে। বর্তমান যুগে আজ আমরা যে অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি সেখানে এ মীমাংসা বা উদ্ধারের পথ আমাদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। আজ আমরা একটা শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছি, এর পরে যেন পথ বন্ধ। এগিয়ে চলবার আর অবকাশ নাই। মানস-চেতনার চিন্তা-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা হয়েছে আজ, তা নিয়ে গিয়েছে অস্পৃশ্য সব আয়তনে— মেফিস্টোফেলিসের ভাষায়:

> The march of intellect which licks all the world
> into shape has even reached the devil.

তাই আজ আমরা যেন অস্তিম দশায় অসহায় অবস্থায় বসে আছি এক অঘটনঘটনপটীয়সীর হঠাৎ আবির্ভাবের জন্যে।

এ জিনিস যে সম্ভব নয়, তা বলছি না। কিন্তু তাতে রহস্যের সব কথা বলা হয় না। মানুষকে ঘিরে আছে এক দৃঢ় গণ্ডীর রেখা, অকাট্য নিয়তির পাশ— মানুষ তাকে কেটে পার হয়ে যেতে পারে; তার এই উত্তরণ-সিদ্ধির সঙ্গে ভগবৎপ্রসাদের বিরোধ কিছু নেই। বরং এই হল ভগবৎপ্রসাদকে সার্থক করার সজ্ঞান প্রণালী। আমরা যাকে বললাম গণ্ডী, প্রাচীন ঋষিরা তাকেই বলেছেন 'হিরণ্ময় পাত্র'— মানসবুদ্ধির প্রোজ্জ্বল প্রচ্ছাদন— যাতে সত্যের মুখ ঢেকে রাখে। এই হিরণ্ময় পাত্রকে সরিয়ে দেবার কি অতিক্রম করবার সাধনা গ্যেটে দিতে পারেন নি— তিনি অজ্ঞানের (অর্থাৎ অর্ধজ্ঞানের) মধ্য থেকে কেবল আহ্বান করেছিলেন পতিতোদ্ধারিণী ভগবৎকরুণাকে। এ হল সেই আর্তভক্তের উদ্বাহু— De profundis clamavi— 'অতলে পড়ে আছি আমি, সেখান থেকে তোমায় ডাকছি, হে ভগবান।'

আমি লেওনার্দোর কথা বলেছি গোড়ায়। গ্যেটের মতো ইনিও ছিলেন মহামনীষী, মানুষী প্রতিভার সমগ্রতার প্রতীক। তবে গ্যেটের মধ্যে যে জিনিসটি ছিল বিরল ও দুর্লভ—মানুষীভাবের অতিক্রমণ— লেওনার্দোর মধ্যে তা অনেকখানি সহজ ও সুলভ। লেওনার্দোর চেতনায় রয়েছে কেমন এক আনন্ত্যের লোকোত্তরের আবেশ বা ছন্দ, গ্যেটে সকল প্রয়াস সত্ত্বেও ঐহিক মানুষই রয়ে গেছেন। গ্যেটে মানুষের ঊর্ধ্বমুখী আশা আকাঙ্ক্ষা আস্পৃহার আবেগ— লেওনার্দো সহজ ঊর্ধ্বস্থিতির প্রশান্ত ঔদার্য। অথবা গ্যেটে এ-পারের আলো, তীব্র সন্ধানী আলো— লেওনার্দোর মধ্যে রয়েছে ও-পারের সৌম্য জ্যোতির ছায়া।

মানবসভ্যতার বিকাশের জন্য দুই প্রকার বিভূতির আবির্ভাব হয়। এক মানুষের মানুষীভাবের আকৃতি নিয়ে, নীচে হতে ঊর্ধ্বের দিকে চলেছে যে জীব— গ্যেটে এই পর্যায়ের। আর-এক হল তারা যারা এসেছে যেন উপরের থেকে, সেখানকার সহজ সিদ্ধি নিয়ে এই ভূতলে, মর্ত্যের মধ্যে অমৃতের আলো তারা বিতরণ করে স্বচ্ছন্দে— লেওনার্দো এই পর্যায়ের। এ ধারায় যাঁরা আবার ঊর্ধ্বতর বা ঊর্ধ্বতম স্তরে, যাঁরা পেয়েছেন পূর্ণভাবে

আত্মার দৃষ্টি তাঁদের নাম হল ঋষি। কবিরা মোটের উপর বলা যেতে পারে প্রকৃতির পূজারী। ঋষি হলেন পুরুষের পূজারী, পুরুষ অর্থ প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রকৃতির যতখানি পূর্ণাঙ্গ গ্যেটের চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছিল অন্যত্র তা আমরা বেশী দেখি না এ কথা সত্য। তবে তাঁর কবিচিত্ত এবং মানব-চিত্তেরও নিভৃত আকুতি ছিল অ-চিৎ ছেড়ে বা ধরে চিৎকে লাভ করা; বলেছি সে সিদ্ধির সন্ধান তিনি পান নি। তার জন্যে নির্ভর করেছিলেন একমাত্র অহেতুক ভগবৎকরুণার উপর। আমরা আশা করি ভগবৎকরুণা তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করেছিল, মুক্তি যদি না দিয়ে থাকে তবে দিয়েছিল শান্তি।

জর্মন কবি রিল্‌কে-র দুটি কবিতা*

রিল্‌কে কে ও কি ছিলেন বাহ্য জীবনে, পরে কিছু বলছি। তাঁর কবিতা দিয়েই আগে তাঁর পরিচয় আরম্ভ করি।

প্রথম, অরফেউস ও ইউরিদিস কবিতাটি। গ্রীকদের এ কাহিনী সুপরিচিত। অরফেউস ছিলেন সঙ্গীতকার, অতুলনীয় সঙ্গীতকার— পশুপাখী তরুলতা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যায় তাঁর সঙ্গীত শুনে। তাঁর প্রণয়িনী ইউরিদিস-এর মৃত্যু হয় হঠাৎ সর্পাঘাতে। মৃত্যুলোকে (Hades) চলে গেলে, অরফেউস-ও তাঁর অনুসরণ করলেন সেখানে অর্থাৎ সশরীরে। এবং তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ করলেন মৃত্যু-দেবতাকে, ইউরিদিসকেও ফিরে পেলেন, তবে এই সর্তে যে ইউরিদিস যখন ফিরে চলবে তাঁর পিছনে পৃথিবীর উপর পৌঁছা পর্যন্ত তিনি তার দিকে ফিরে তাকাবেন না, তাকালেই ইউরিদিসকে হারাতে হবে, সে ফিরে চলে যাবে অধোলোকে। কার্যতঃ অরফেউস ভুলে গেলেন তাঁর সর্তের কথা, পৃথিবীর নিকটে এসে ফিরে তাকালেন ইউরিদিস এল কি না দেখবার জন্যে আর হারালেন তাকে।

লাতিন কবি ভর্জিল বলেছেন এ কাহিনী, মাধুর্যে কারুণ্যে অতুল সে কাব্য বিশ্বসাহিত্যে। অরফেউস আনন্দে ঔৎসুক্যে আপ্লুত হয়ে ফিরে তাকালেন, ইউরিদিস বেদনায় বলে উঠলেন—

> কি করলে তুমি, হতভাগ্য দুজনাই আমরা,
> এই যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোথায়, কোথায় তোমার হাত,
> অন্ধকার রাত্রি যে ঘিরে এল, বিদায়, বিদায়…[১]

রিল্‌কে কিন্তু এ করুণ পরিণতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মৃত্যুলোকে গিয়ে, মৃত্যুর আবহাওয়ায় ইউরিদিস-এর ঘটেছে রূপান্তর— sea-change (শেক্সপীয়রের ভাষায়)। শুধু দেহগত নয়, তার মধ্যে এসে গিয়েছে চিত্তগত বিপর্যয়, কেবল ভৌতিক নয়, তার হয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নবগঠন। রিল্‌কে দিয়েছেন চিত্রটি এইভাবে—

* Rainer Maria Rilke: *Requiem and Other Poems,* translated and edited by J. B. Leishman. (The Hogarth Press)

১ Jam que vale: feror ingenti circumdata nocte,
Invalidas que tibi tendens, heu! non tua, palmas.

ইউরিদিস তবে ফিরে চলেছে মৃত্যুলোক হতে মর্ত্যলোকে, অরফেউসের পিছনে, দুজনের মাঝখানে, ইউরিদিসের ঠিক সামনে পথ দেখিয়ে চলেছেন দেবতাদের দূত মার্কারি (বুধদেব)। এ দেবদূত কি রকম? মনোহারী—এবং গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ। রিল্কের এই আলেখ্য—রিল্কের ভাষার যাদু ইংরেজী অনুবাদেও আমরা কথঞ্চিৎ অনুভব করতে পারি—বাংলা অনুবাদ দিতে পারে তার দূর প্রতিধ্বনি :

পথচলার দেবতা, দূর বার্তার দেবতা।
দীপ্ত আঁখি দুটির উপর ঝুঁকে পড়েছে তার পথযাত্রির মস্তক আবরণ।
হাতের যাদুদণ্ড দেহের সম্মুখে প্রসারিত,
পায়ে ডানা ধীরে দুলে চলেছে,
বাঁ হাতে ধরে রেখেছে তার কাছে যে সমর্পিত—তাকে।[২]

আর ইউরিদিস?

নিজের মধ্যে নিজেকে ঢেকে রেখেছে—তার সময় যে হয়ে এল—চিন্তা করে না, পতি তার সামনে এগিয়ে চলেছে, কি রাস্তা তার উঠে চলে মিশেছে আবার জীবন ধারায়।
ঘিরে রেখেছে নিজেকে নিজের মধ্যে, চলেছে আনমনে—মৃত্যু তার কি পূর্ণতা দিয়ে তাকে পূর্ণ করে তুলছে।
পরিণত ফলের মধুরতায় আর গাঢ় আঁধারে পূর্ণ হয়ে, সে রয়েছে তার মহামরণের সঙ্গে মিলে—এমন নতুন জিনিস তা, আর কিছু সে সময়ে আর তার অন্তরে প্রবেশ করে না।
ফিরে আবার সে কুমারী হয়ে উঠেছে নূতনভাবে, স্পর্শের অতীত এখন, নারীত্ব তার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় ফুলের মত আপনাকে গুটিয়ে নিয়েছে, পাংশুল অঙ্গ তার হারিয়ে ফেলেছে পত্নীত্বের অভ্যাস সব…[৩]

The god of faring and of distant message,
the travelling-hood over his shining eyes,
the slender wand held out before the body
the wings around his ankles lightly beating
and in his left hand, as entrusted, *her*.

Wrapt in herself, like one whose time is near,
she thought not of the husband going before them,
nor of the road ascending into life.
Wrapt in herself she wandered. And her deadness
was filling her like fullness.

আর সে সেই সুন্দরী রমণী নয়, কবির কাব্যকে যে একদিন প্রতিরণিত করে তুলেছিল, আর সে সুরভিত প্রসারিত শয্যার ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, পতির সম্পত্তি নয়।

দীর্ঘ কুন্তলের মতো ঝুলে পড়েছে সে, বৃষ্টির মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু বিচিত্র অবদানে আপনাকে বিতরণ করে দিয়েছে— ফিরে গেল সে তার আদি সত্তায়, লাভ করলে কেবল মূল-রূপ...

দিশারী দেবতা করুণ কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠলে, 'এই যে, হায়, ফিরে তাকাল!' স্পর্শ করলে না কিছু তাকে, উত্তরে বললে মৃদুকণ্ঠে— 'কে?'*

মৃত্যুর অপরূপত্ব রিল্‌কে-কাব্যের মূল সুর। মৃত্যু একটা অপশক্তি নয়, যা ঘটায় দেহের অবসান শুধু। দেহের অবসান একটা নিবিড় উদার মহামুক্তির লক্ষণ। মৃত্যুকে বার বার বলা হয়েছে মহামৃত্যু (the great death)। মৃত্যুর স্পর্শ ঘুচায় পার্থিব ব্যক্তিত্বের বন্ধন, দূর করে আধারের ইন্দ্রিয়জ সুখবোধ— আধার হয়ে ওঠে রসবর্জিত ('রস বর্জং'), উদাসী, তপস্বী, আর নাম-রূপের সীমানা ভেঙে দিয়ে নিয়ে আসে বিশ্বের সকলের আধারের সঙ্গে সাম্য ও সমপ্রাণতা। মৃত্যুর এই স্বরূপ দ্বিতীয় কাহিনীটির মধ্যেও রিল্‌কে ফুটিয়ে ধরেছেন। এটিও গ্রীক কাহিনী— 'আলসেস্‌টিস্ ও আদমেতস্' (Alcestis and Admetus)। আদমেতস্ মৃত্যুর দুয়ারে— জীবন সে ফিরে পেতে

* Full as a fruit with sweetness and with darkness
was she with her great death, which was so new
that for the time she could take nothing in.

She had attained a new virginity
and was intangible; her sex had closed
like a young flower at the approach of evening
and her pale hands had grown so disaccustomed
to being a wife . . .

Even now she was no longer that fair woman
Who'd sometimes echoed in the poet's poems,
no longer the broad couch's scent and island,
and yonder husband's property no longer.

She was already loosened like long hair,
and given far and wide like fallen rain,
and dealt out like a manifold supply.

She was mere root.
And when, abruptly swift,
the god laid hold of her, and, with an anguished
cry, uttered the words: He has turned round!—
she took in nothing, and said softly: Who?

পারে যদি আর কেউ বদলে মৃত্যু বরণ করে। বৃদ্ধ পিতা রাজি হলেন না, যুবক বন্ধুও ফিরে চলে গেল— রাজি হয়ে এল তার পত্নী আলসেস্‌টিস্‌। আমাদের মহাভারতে আছে যযাতি-পুরু উপাখ্যান, পুত্র পুরু গ্রহণ করেছিলেন পিতা যযাতির বার্ধক্য।

গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস্‌ তাঁর বিখ্যাত নাটকে দেখিয়েছেন পত্নীর আত্মত্যাগের সৌন্দর্য ও মহিমা, পরম কারুণ্যে অভিষিক্ত করে। কিন্তু রিল্‌কে সে দিক দিয়ে যান নি। আলসেস্‌টিস্‌ এল ধীরে প্রশান্ত পদক্ষেপে, মৃত্যুর কাছে নিজেকে ধরে দিতে, মৃত্যুর সঙ্গে চলে যেতে। মৃত্যুর কাছে সে যেন বহু আগেই ধরে দিয়েছে, বহু পূর্বেই সে নিবেদিত উৎসর্গীকৃত। সকল জিনিসের পারে সে চলে গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে সব বস্তু তার মধ্যে।[৫] মৃত্যু একটা পরম উপরতি, সকল তৃষ্ণাবিবর্জিত প্রশান্তি। ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বিমুক্ত আনন্ত্য, এক থেকে বহুর মধ্যে একাত্মতা। তাই ত মৃত্যু যখন গ্রহণ করলে এই নারীকে, তখন তাঁর মুঠির মধ্যে এল যেন এক যাদুকণা যার ভিতরে ছড়িয়ে রয়েছে শত মানুষের জীবন। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে আমরা মিশে যাই বিশ্বের পঞ্চভূতে একটা গভীর অর্থে— বিশ্বের উদাসীন প্রশান্ত জীবনধারার সঙ্গে একীভূত হয়ে লাভ করি একটা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক গতি। মৃত্যুর পরে 'লুসী'র পরিণতি সম্বন্ধে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই ধরণের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রিল্‌কে স্পষ্টই আর একটি কবিতায় বলছেন :

> যখন তার মৃত্যু হল, ভারহীন নামহীন কিছুর মত ছড়িয়ে পড়ল সে সর্বত্র ; বীজ তার বয়ে চলল নদীর স্রোতে, গেয়ে চলল তরুলতার মধ্যে, চেয়ে রইল প্রশান্তভাবে ফুলের ভিতর থেকে— রইল সে একান্তে, চলল সে গেয়ে।[৬]

বিশ্ববস্তুর সঙ্গে আত্মার এই বহুবিচিত্র ঐক্যের আলেখ্য আরো দিয়েছেন রিল্‌কে এই ভাবে :

৫ for no one's reached the end
of everything as I have. What remains
of all I used to be.

৬ And when he died, light as without a name, he was distributed: his seed ran in brooks, his seed sang in the trees and looked peacefully at him from flowers. He lay and sang.

নামহীনের সঙ্গেই আমার গাঢ়তর অন্তরঙ্গতা। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে, পাখীর মত যেন আমি আকাশের হাওয়ায় উড়ে যাই…[৭]

রিল্‌কের মূল ভাষা বড় সুন্দর এখানে—

mit meinen Sinnen, wie mit Vögeln, reiche
ich in die windigen Himmel aus der Eiche.[৭]

আর আমার অনুভূতি মাছের উপর ভর করে ডুবে যায় যেন আলোক-চঞ্চল পুকুরের তলায়।[৮]

মৃত্যুকে রিল্‌কে অনেক সময়ে বলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছায়াগাঢ়— অর্থাৎ এ পরিণাম একটা নিবিড় প্রচ্ছন্ন পরিপূর্ণতা, সে হল যেন শিকড়ের অসম্বৃত আত্মসমাহিতি।

তাই তুমি এত শ্যামল, হে মৃত্যু, তোমার সীমানায় এসে আমার ক্ষুদ্র আলো তার কোন অর্থ খুঁজে পায় না।… তোমার শক্তির অভিরামলীলা, তোমার অপরূপ সেবাব্রত শিকড়ের মধ্যে বেড়ে চলেছে, বৃক্ষকাণ্ডে মিলেমিশে গিয়েছে, শাখার শিখরে নবজন্ম লাভ করেছে।[৯]

এই হল আসল রহস্য— মৃত্যু মৃত্যু নয়, তা হল পুনর্জন্ম, রূপান্তর। তাই ত মৃত্যু যখন আলসেস্‌টিস্‌কে নিয়ে চলেছে, তখন দেখলে :

সেই কুমারীর মুখখানি তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে হাস্যময়, আশার ও ভরসার আলো যেন, ফিরে আসবে আবার পরিণত হয়ে, মৃত্যুর পাতাল থেকে তারি কাছে জীবনের পূজারী যে…[১০]

৭ mit (with) meinen (my) Sinnen (senses), wie (as) mit (with) Vögeln (birds), reiche (reach) ich (I) in (into) die (the) windigen (windy) Himmel (sky) aus (from) der (the) Eiche (oak).

৮ I feel more intimate with the Nameless: with my senses, as with birds, I reach from the oak into the windy skies, and my feeling, as though standing on fishes, sinks into the fragmentary day of ponds.

৯ You are so dark, my little brightness on your border has no meaning . . .

(Du bist so dunkel ; meine kleine Helle
au deinem Saum hat keinen Sinn . . .)

Such is the wondrous play of forces, passing so serviceably through things: growing in roots, vanishing into the trunks, and in the tree-tops like resurrection.

১০ He saw the maiden's face, that turned to him,
smiling a smile as radiant as a hope,
that was almost a promise: to return,
grown-up, out of the depths of death again
to him, . . .

২

রিল্কে জর্মন বলেছি। তাঁর জন্ম প্রাগ সহরে, চেকোশ্লোভাকিয়া দেশে—অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তখন। স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন বটে, ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য তৈরীও করছিলেন নিজেকে। কিন্তু বরাবর তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির, অমিশুক, নির্জনতা-প্রিয়। শিক্ষায় ও জীবন-ধারায় জর্মন-ব্যবস্থার যে কড়া আইন-কানুন সে-সব তাঁর কাছে উৎপীড়ন বলে মনে হত। জীবনে দুটি তীব্র অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষ অভিভাবিত ও অভিভূত করে। এক, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ—প্রথম বারের। তাঁকে সৈনিক হয়ে যোগদান করতে হয়েছিল, যদিও তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্যে শেষে কেরাণীর কাজ দেওয়া হয়েছিল। দ্বেষ হিংসা রেষারেষি রক্তারক্তি তাঁর উদার উদাসী কোমল প্রকৃতির ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষের এ রকম নির্মম উগ্র পাশব বৃত্তি তিনি সহ্য করতে পারেন নাই। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হল ফরাসীদেশে আগমন। ফরাসীর মানস প্রকৃতি ও সংস্কৃতি তাঁকে মোহিত করেছিল— তাঁর মধ্যে স্থান পেয়েছিল ফরাসীর সুমার্জিত সুরুচি— ভাষায়, ভাবে, আচারে—জর্মনির অতীন্দ্রিয় দার্শনিকতার সঙ্গে। কিন্তু ফরাসীদেশে এসে যে দৃশ্য তাঁকে বিভ্রান্ত ব্যথিত করলে তা হল শ্রেণীবদ্ধ হাসপাতাল রাস্তায় রাস্তায় অর্থাৎ যত দুঃস্থ রোগী অসহায়ের এক রকম অসহ্য আবহাওয়া— তাঁর কারুণ্যপূর্ণ পারলৌকিকতা এই অভিজ্ঞতায় হয়ত আরো শাণিত হয়ে উঠেছিল। তবে ফরাসী দেশের বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁর হল ভাস্কর রোডিন-এর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বস্থাপন। এ দুজনের আন্তর ভাবের মিল এক রকম অসাধারণ ছিল। রোডিনের প্রভাবে রিল্কের ভাবে ও রচনার ধারায় ঘটেছিল বিশেষ পরিবর্তন। রিল্কে গোড়ায় ছিলেন অনেকখানি ভাববিলাসী, তাঁর চেতনায় ও তার প্রকাশ-ভঙ্গিমায় দৃঢ়তার নিশ্চয়তার চেয়ে বেশি ছিল মাধুর্য, রোমান্টিক-সুলভ উচ্ছ্বাস ও অস্পষ্টতা; কিন্তু রোডিনের সংস্পর্শে রিল্কের এল ভাস্কর্য-সুলভ আত্মস্থতা, দৃঢ়তা, পরিচ্ছিন্নতা, সংহত স্বচ্ছতা।

রিল্কে রুষদেশও ঘুরে এসেছিলেন। রুষের যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্পর্শ করে তা হল তার প্রগাঢ় আস্তিকতা (আজও সে আস্তিকতা প্রকাশ পায়

নাই কি তার নাস্তিকতার মধ্যে ?), আর একটা অসীমতা ও নিরবচ্ছিন্নতার আবহাওয়া। এ সবই রিল্‌কের কবি-চেতনার উপাদান হয়েছিল।

রিল্‌কের আন্তর জীবন একটা তীব্রতা, প্রগাঢ় আত্মস্থতায় পরিপূর্ণ থাকলেও, তার মধ্যে এসেছিল প্রসন্নতা শান্তরসাস্পদতা। জীবনে বাহ্যতঃ তাঁকে খুব বেশি বিরোধ-সংঘর্ষ-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে যেতে হয় নাই। অভাব-অভিযোগ তাঁর কমই ছিল। বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতি সংযোগ সর্বদাই পেয়ে এসেছিলেন। তবে তাঁর দেহ কোন দিন খুব সবল ছিল না— অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ নিভে এল— শেষ হল একটা শান্তিরই মধ্যে।

রিল্‌কে আগুনের কবি, আলোর কবি ; সে-আগুন এ-পারের সব পুড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যায় ও-পারের আলোকে।

> Yes I know where I come !
> Yes I know from where I came !
> Ever hungry like a flame
> I consume myself and glow.
> Light grows all that I conceive,
> ashes everything I leave :
> Flame I am assuredly.[১১]

পরিণতি হল একটা পরিপূর্ণতা, এখান থেকে চলে গিয়ে আবার নব ভাবে ফিরে এসে নবীন সার্থকতা :

> Over the nowhere arches the everywhere
> Oh, the ball that is thrown, that we dare,
> does not fill our hands differently than before ?
> By the weight of return it is more.[১১]

পূর্বে যে পুনর্জন্মের কথা আমরা বলেছি সেই resurrection-এরই বাণী প্রতিধ্বনিত এখানেও।

১১ এ দুটি অনুবাদ আর-এক জনের কৃত (Kaufman)

কবি হুয়ান রামন হিমেনেথ *

হুয়ান রামন হিমেনেথ কবি— সত্যকার কবি। সত্যকার কবি এই জন্য যে তিনি প্রায় নবীর পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছেন অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি ও বাণী লাভ করেছে একভাবে মন্ত্রেরই মাহাত্ম্য— তাতে রয়েছে অর্থের গাঢ়তা আর রূপের সুষমা। তাঁর লক্ষ্য তাঁর অন্তরঙ্গ ভগবানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন :

তুমি এসেছ আমার উত্তরকে নিয়ে আমার দক্ষিণ দিকে
তুমি এসেছ আমার পূব হতে আমার পশ্চিম দিকে—
তুমি আমার সঙ্গে চলেছ, হে অদ্বিতীয় ক্রুশফলক, তুমি আমাকে
পথ দেখিয়ে চলেছ।
ঐ চিরন্তন দিক চতুষ্টয়ের মধ্যে
আমায় সর্বদা রেখেছ তার কেন্দ্রস্থলে, আমারও যা কেন্দ্রস্থল,
যা আবার তোমারি কেন্দ্রস্থল।[১]

কথাগুলি স্পষ্টই রহস্যময়— বৈদিক ঋষি যাকে বলতেন নিণ্যা বচাংসি, নিগূঢ় বাক্‌, কিন্তু একান্ত রহস্যময় বা অবোধ্য নয়, যদি আমাদের আন্তর চেতনা একটু সজাগ ও উন্মুখী হয়ে থাকে। কবি নিজেই পরে একটু স্পষ্ট করে বলছেন :

সবই চালিত হয়েছে
এই প্রাণবন্ত সম্পদের দিকে,
হে আকাঙ্ক্ষিত, হে আকাঙ্ক্ষী ভগবান,
খনির মধ্যে আমার হীরকখণ্ড আমার জন্য অপেক্ষা করছে…

* Juan Ramón Jimenez—স্পেনীয় ভাষায়, j = h (হ) আর z = th (থ)। এ হল বিশুদ্ধ উচ্চারণ— তা ছাড়া z = s (অর্থাৎ ss), এ উচ্চারণও চল আছে, বিশেষতঃ দুই আমেরিকায়। জন্ম ১৮৮১ সালে, স্পেন দেশে। অন্তর্বিপ্লবের সময়ে (তিরিশের দশকে) উদারমতাবলম্বী ছিলেন বলে দেশ ছেড়ে যেতে হয়। প্রথমে বহুকাল থাকেন দক্ষিণ আমেরিকায়— বর্তমানে উত্তর-আমেরিকাতে এসে বাস করেছেন (শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আছেন)। সাহিত্যে ১৯৫৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

১ TÚ VIENES CON MI NORTE HACIA MI SUR
Thou comest with my north towards my south
TÚ VIENES DE MI ESTE HASTA MI OESTE
Thou comest from my east to my west

সর্বত্র তিনি সর্বভূতান্তরাত্মা— চিন্ময় তিনি, প্রেমময় তিনি। এই সৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যে ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত তিনি, তাকে চার দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, তার সর্বোচ্চ শিখর অবধি :

তোমার সহস্র দিক দিয়ে তুমি সকলের কাছে এসেছ
সকলের মধ্যে বাস কর তুমি তোমার সহস্র প্রতিধ্বনি আশ্রয় করে,[২]
তোমাতে এমন একটিও স্ফুলিঙ্গ নাই কোথাও,
সুখী হোক আর দুঃখী হোক, কোনো-না-কোনো চোখে গিয়ে
যে আঘাত করে না…
কারণ, তুমি ভালবাস, আকাঙ্ক্ষিত ভগবান, আকাঙ্ক্ষী ভগবান,
আমি যেমন করে ভালবাসি।

'আকাঙ্ক্ষিত ভগবান, আকাঙ্ক্ষী ভগবান' এই বাক্যটি বারবার উল্লেখ করছেন মন্ত্রজপের মত— এবং এর মধ্যে পাই হিমেনেথের একটা বৈশিষ্ট্য— সাধারণভাবে যা বলতে পারি ভক্তের বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ ভগবান মানুষের, জগতের, প্রতি জীব ও বস্তুর বাঞ্ছিত কাম্য; কিন্তু এই যে বাঞ্ছা কামনা সৃষ্টির মধ্যে দেখা দিয়েছে স্রষ্টার জন্যে, তার হেতু ভগবান নিজে বাঞ্ছা করেন কামনা করেন তাঁর সৃষ্টিকে। আর-একজন ঋষি-কবি অনুরূপ ভাবেরই কথা বলছেন—

স্বর্গ তার আনন্দ নিয়ে স্বপ্ন দেখে নিখুঁত পৃথিবীর,
পৃথিবী তার দুঃখ নিয়ে স্বপ্ন দেখে নিখুঁত স্বর্গের।[৩]

ভগবান আনত হয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে— এই হল ভগবানের আকিঞ্চন, আকাঙ্ক্ষী ভগবান নেমে এসে নিজেকে অনুস্যূত করে রেখেছেন পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার মধ্যে। এই নিভৃত চেতনার কল্যাণে, ভাগবত আকিঞ্চনের প্রেরণায় আবার প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণ উঠে চলেছে ঊর্ধ্বে, পেয়েছে ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করবার উৎসাহ।

২ A TODOS LLEGAS TÚ POR TUS MIL LADOS
To all thou comest by thy thousand sides
EN TODOS VIVES TÚ CON TUS MIL ECOS
In all thou livest with thy thousand echoes

৩ Heaven in its rapture dreams of perfect earth,
Earth in its sorrow dreams of perfect heaven.
—Sri Aurobindo, *Savitri*, xi.

ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা ধারা— খৃস্টীয় ধর্মে যা বিশেষ প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে— তা হল জগৎ-অতীত, জগৎ-বিচ্ছিন্ন ভগবান, স্রষ্টা বা প্রভু-মাত্র ভগবান। ভগবান যে জগতের মধ্যে রয়েছেন ওতপ্রোত, ভগবান যে জগৎ হয়েছেন, জগৎ জগতের প্রতি বস্তু যে ভগবানই এই অনুভব পাশ্চাত্যে বিরল, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার তা একান্ত পরিচিত অঙ্গ। ইউরোপে একে Pantheism নাম দেয় এবং সাধারণতঃ সুনজরে দেখা হয় না, প্রাচীনতর অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় বলে একে সরিয়ে রাখা হয়। এই দোষে দার্শনিক স্পিনোজা একদিন তাঁর সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। যা হোক, কবি হিমেনেথ কিন্তু এই অনুভবের মধ্যেই পেয়েছেন তাঁর নিবিড়তম পূর্ণতম মর্মবাণী— এবং তাকে এমন গাঢ় গভীর ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করেছেন যে তা বৈদান্তিক পর্যায়ের উপলব্ধি হয়ে উঠেছে।

ভগবান হলেন চিন্ময়, চৈতন্যই তাঁর স্বরূপ— আর চৈতন্য সর্বব্যাপক, অখণ্ডমণ্ডলাকার (কবির কথা, DIOS EN REDONDA CONCIENCIA— God of rounded consciousness)। তাই কবি বলেছেন—

এই চেতনা আমায় ঘিরে ছিল
আমার সারা জীবন ধরে,
জ্যোতির্মণ্ডলের মত, সূক্ষ্ম কোষের মত, আবহাওয়ার মত
আমারই নিজের সত্তার,
কিন্তু এই যে এখন সে আমার অন্তরের মধ্যে স্থাপিত।
সে জ্যোতির্মণ্ডল এখন অন্তরে আমার,
দেহ আমার এখন আমার 'আমি'র প্রত্যক্ষ কেন্দ্র—
আমি হলেম এই জ্যোতির্মণ্ডলের প্রত্যক্ষ পরিণত দেহ—
ফল যেন, তার নিজেরই ফুলের, এখন সে হয়ে উঠল
আমারই ফুলের ফল।

আত্মার ও দেহের, চৈতন্যের ও জড়ের একাত্মতা, একত্ব— অনুপম এ অদ্বৈত-সিদ্ধি। বাহিরে যে সর্বব্যাপী চেতনা ছিল, বিশ্বসত্তা, যাকে নাম দিয়েছিলাম ভগবান, এখন দেখছি তাই আমার অন্তরে আমি হয়ে দেখা দিয়েছে— আমি-রূপ সেই ভাগবত অন্তশ্চেতনারই পরিণত প্রকাশ আমার এই বিশ্বাঙ্গীভূত দেহ। অন্তরে তুমি যদি ফুল হয়ে রইলে বাহিরে আমিই তোমার ফল।

ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই যে ঐকান্তিক সাযুজ্য ও সাধর্ম্য, তা অপূর্ব কাব্যশ্রী গ্রহণ করে প্রকাশ পেয়েছে এই কবির মধ্যে ; তিনি তাই উৎসাহে প্রায় প্রগল্‌ভ হয়ে বলে চলেছেন—

আজ তা হলে তোমার জন্যে হে আকাঙ্ক্ষিত,
হে আকাঙ্ক্ষী ভগবান, আমি হয়ে উঠেছি আমারই ফুলের ফল—
চিরসবুজ, চিরকুসুমিত, চিরফলবান,
আবার সোনালী আবার হিমশুভ্র আবার সবুজ
আর এক কালে…
ভগবান, আমি যে আমার নিজের মর্মকেন্দ্রের, অন্তঃস্থ তোমার
আবেষ্টন হয়ে উঠেছি।[৪]

বাহির অন্তর কি রকম এক হয়ে গিয়েছে, বাহির কি রকমে অন্তরে এসে প্রবেশ করেছে, অন্তরটাই যেন বাহিরের আবেষ্টন আবরণ হয়ে উঠেছে—এই রতি-বৈপরীত্য আমাদের কবি বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন। সাগরের আরাব শুনছেন যখন তিনি তখন কি শুনছেন ?—

তোমার বাণী আমি শুনতে পাই, মহাসাগর,
নিজে তুমি যা শোন না—
আমি শুনি সেই শ্রবণ দিয়ে যা আমি পেয়েছি
আমার ভগবানের মধ্যে,
আমার বাঞ্ছিত বাঞ্ছাময় ভগবান ;
তাঁর সঙ্গে, তাঁরই মত শুনি আমি…
ভগবানের শ্রবণ দিয়ে তোমাকে শুনি আমি, সাগর…
তোমার কথা আমি শুনতে পাই,
আমার অন্তরে ভাগবতী চেতনা আমার জন্যে সম্পূর্ণ খুলে ধরেছে
তোমার সত্তা,
সেখানে তুমি এসে প্রবেশ করলে তোমার বিপুল আরাব নিয়ে,
তোমার প্রেমের সেই অসীম সংগীত নিয়ে—

৪ DIOS, YO SOY LA ENVOLTURA DE MI CENTRO
God, I am the envelope of my centre.
DE TI DENTRO
Of Thee within.

উপনিষদ যে বলছে— যৎশ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্— সেই 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্র'ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেন এখানে। আর চক্ষুর চক্ষু দিয়ে আমরা যখন দেখি, শ্রবণের শ্রবণ দিয়ে যখন শুনি তখনই আমাদের হয় দিব্যদৃষ্টি দিব্যশ্রুতি— বিশ্ব পরিবর্তিত রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় তার ভাগবত দিব্য কান্তি নিয়ে। কি রকম? সব আলো, সব আলো— আলোয় আলোময়— চিন্ময়, জ্যোতির্ময়— অন্তরের অন্তরে সেখানে :

এই দেখ পৌঁছে গেলাম গন্তব্য দেশে
সেখানে তোমার লোকেরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল,
হে বাঞ্ছিত ভগবান—
আমার জনেরাও অপেক্ষা করছিল,
তোমার এত বৎসর ধরে আমাকে চেয়ে,
অপেক্ষা করছিল তোমার সঙ্গে আমার জন্যে,
অপেক্ষা করছিল আমার সঙ্গে তোমার জন্যে ;
আর, কি আলো কি আলো তাদের মধ্যে
মধ্যাহ্নের অপ্রত্যাশিত নির্ঝরিত সূর্যের নীচে,
লাল মিনার শোভিত ঊষার উপরে,…
কি আলো তাদের চোখের মধ্যে, অধরোষ্ঠের মধ্যে, হাতের মধ্যে—
কি বসন্ত স্পন্দিত সেখানে,
কি তুমি তাদের অন্তরে, তুমি আমাদের মধ্যে—
কি আলো, কি প্রসারিত দৃশ্য—
বুকের, কপালের— তাদের যারা যুবক, সাবালক, শিশু—
কি গান, কি কথা
কি আলিঙ্গন, কি চুম্বন
কি উত্তরণ তোমার আমাদের মধ্যে,
উঠে এলে যেখানে রয়েছ তুমি সেখানে অবধি,
এই যে তুমি, তোমার উপর তোমাকে স্থাপন করেছ,[৫]
যাতে সকলে সোপান বেয়ে উঠে আসতে পারে—
জড় দেহে আর আন্তর আত্মায়—

[৫] স্মরণ করিয়ে দেয় চণ্ডীদাসের : ঢেউএর উপরে ঢেউএর বসতি।

জাগ্রত চেতনা অবধি সেই ধ্রুবতারা অবধি
যেখানে সংগৃহীত পরিপূর্ণ একীভূত করেছে
বিশ্বের তারাপুঞ্জ, শাশ্বত সাকল্যের মধ্যে
শাশ্বত সাকল্য যা আবার আন্তর সাকল্য।[৬]

আধ্যাত্মিক অনুভূতির, ভগবানের সঙ্গে মিলনের, বিশ্বের সঙ্গে মিলনের, এ এক অপরূপ বর্ণনা। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, উপরের সঙ্গে নীচের সমীকরণ সমুচ্চতম চেতনায়, তারও কি মধুর চিত্র। আর এই বিশ্ব-সাধনায় মানুষের মত ভগবানেরও কি প্রয়াস (আকাঙ্ক্ষী যে ভগবান), এ রহস্য কেমন নিবিড় রহস্যময় ভঙ্গীতে প্রস্ফুট। দুয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ— দ্বৈতাদ্বৈত,— এক দিকে বৈদান্তিক, অন্য দিকে বৈষ্ণব— যে অন্যোন্যাশ্রয় ও পারম্পর্য, পরম একাত্মতা ও একত্ব এবং তারই সঙ্গে উভয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য পেয়েছে কবির ভাবে ও ভাষায় অদ্ভুত চমৎকারিত্ব।

কবি বলেছেন সাকল্যের সামগ্র্যের কথা, জাগ্রত চেতনা আর জড় দেহের কথা অর্থাৎ এদের উন্নয়নের বা উর্ধ্বায়নের কথা। ফলত সমস্তের উর্ধ্বায়ন, মানুষের সাধনার মূল কথাই ত এই। ভূতলে রক্তমাংসের মধ্যে পাশব স্তরে মানুষ আছে পড়ে— সেখান থেকেই ত তার কণ্ঠ উঠেছে— গভীর অতলে অন্ধকারের মধ্যে পড়েই ত সে ডাকছে উপরের আলো— De profundis clamavi— Out of the depths have I cried unto Thee, O Lord ![৭]

ফলত কবির পরিণত বয়সের যে গ্রন্থখানি থেকে আমি কবির পরিচয় দিয়েছি তার নামই হল ANIMAL DE FONDO (গভীরের বা অন্তস্তম পশু)। এই পশুর উদ্ধার, এই পশুর রূপান্তর মানুষের আন্তর জীবনের ইতিহাস। কবি বলেছেন, আমরা দেখেছি, প্রথম তাঁর দৃষ্টি ছিল বাইরে, ভগবানকে দেখলেন চারি দিকে বিশ্বের বহিরঙ্গণে— পরে সেসব গুটিয়ে যেন এল ভিতরে— 'ঘর করিনু বাহির বাহির করিনু ঘর'। এই নীচের তলের কথাটা বলি তবে এখন, কি রকমে তা হয়ে উঠল উপরের তল :

৬ EL TODO ETERNO QUE ES EL TODO INTERNO
The eternal All that is the internal All
৭ Psalms, cxxx

তুমি ছিলে যাদুময় অতলের তলে নিয়তি হয়ে—
সৌন্দর্যময় ইন্দ্রিয়ালুতার নিয়তি যত, তাদের নিয়তি—
যে জানে মহাধর্ম হল প্রেমিক চেতনায়
পূর্ণ আনন্দ উপভোগ—
সে ধর্ম তবে রয়েছে আমাদের অতিক্রম করে ;
তুমি ছিলে এ কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে
যে তুমি হলে তুমি,
আমি যাতে অনুভব করতে পারি যে আমি হলেম তুমি
আমি যাতে উপভোগ করতে পারি যে তুমি হলে আমি
আমি যাতে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি আমি হলেম আমি
এই যে হাওয়ার অতলের মধ্যে রয়েছি সেখানে,
আমি যেখানে পশু হাওয়ার অতলে,
ডানা আছে যার কিন্তু বাতাসে ওড়ে না,
ওড়ে চেতনার আলোকে—
সকল অসীম সকল অনন্তের যে স্থপ্তি তার চেয়েও বৃহত্তর···

এ সম্ভব হয়েছে আমি উঠতে পেরেছি, পার হয়ে যেতে পেরেছি আলোর জগতে ; তার কারণ, আমি পশু বটে এই পৃথিবীর 'পরে, গুহার মধ্যে, গহ্বরের মধ্যে— কিন্তু সেটি একান্ত মাটির নয়, হাওয়ার গহ্বর ; আর আসল কারণ, তুমিও রয়েছ সেখানে আমার সঙ্গে এক হয়ে— আলো হয়ে।

মানুষে ভগবানে, আত্মায় পরমাত্মায় এই যে মিলন এই যে ঐক্য ও একত্ব তা কেবল আলোর চৈতন্যের সম্বন্ধ নয়, বৈদান্তিক উপলব্ধি নয়— তা হল আবার একটা পরানুরক্তির সিদ্ধি। ভগবানের আর মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটিই হৃদয় :

গোলাপ ফুল দিয়ে একটি হৃদয় তৈরী
তোমাতে আমাতে, ভগবান,
তুমি চাও আমার জীবন
আর আমি চাই তোমার জীবন[৮]

৮ UN CORAZÓN DE ROSA CONSTRUÍDA
A heart of Rose built

এ অপরূপ সম্বন্ধ কি শুধু তোমাতে আমাতে? বিশ্বের সঙ্গেই ত তোমার সেই এক সম্বন্ধ

চিন্ময় ভগবান, তুমি জগতের উপর আনত হয়েছ
সমগ্র মুখের পরিপূর্ণ চুম্বনের মত··· *

২

কবির এই প্রেম, এই ভাগবত প্রেম, প্রেম বটে, গাঢ় গভীর এবং সমুন্নত প্রশান্ত— এখানে নাই হৃদয়ের সেই আবিল বিক্ষোভ যার বিরুদ্ধে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ সাবধান করে দিয়েছেন:

The gods love not the tumult of the soul.

ফলতঃ এরই নাম আমরা যদি দেই amor intellectualis Dei তবে বোধ হয় বেশি ভুল হবে না। স্পিনোজার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি— তাঁর এই বাক্যটির সদর্থ নিষ্কাষণ করা একটু কঠিন। তিনি নিজে যে অর্থ করেছেন তা হল সাম্য, সমতা, সমদৃষ্টি— এর খুব বেশি কিছু নয়। বাক্যটির দুটি অঙ্গ পরস্পরবিরোধী বলেই ত আমরা বোধ করি। স্পিনোজার নিজের মধ্যেও intellectualis যতখানি পাই, amor ততখানি কিছু পাই কি? ও দুটি কথা একসঙ্গে সোনার পাথরের বাটি বলেই বোধ হয়।

কিন্তু এ দুটির অপরূপ একীকরণ একাত্মতা হয়েছে দেখি এই স্পেনীয় কবির মধ্যে। স্পেন এক অদ্ভুত দেশ— তার জাতীয় চরিত্রে ঘটেছে একান্ত বৈপরীত্যের মিশ্রণ— পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের, খৃস্টান ও মোসলেমের, কল্পনার ও বাস্তবের— এক দিকে matador (বৃষযোদ্ধা) আর-এক দিকে mystic (আধ্যাত্মিক সাধক)। হিমেনেথ সত্যই একটা চমৎকার রসায়ন— অ্যালকেমী— ঘটিয়েছেন; নীচেকার পশুকে যেমন ব্যোমচারী করে ধরেছেন,

ENTRE TÙ, DIOS DESEANE DE MI VIDA,
Between you, God desirous of my life
Y, DESEANTE DE TU VIDA, YO
And desirous of Thy life, me.
DIOS EN CONCIENCIA CAES SOBRE EL MUNDO
God in consciousness thou fallest upon the world
COMO UN BESO COMPLETO DE UNA CARA ENTERA
Like a kiss complete of an entire face

ভগবানকে যেমন মর্ত্যের মধ্যে অনুস্যূত করে ধরেছেন, তেমনি প্রাণকে হৃদয়কে পরিস্রুত করে তুলে ধরেছেন বুদ্ধির প্রশান্ত স্বচ্ছ স্থৈর্য ও ঔদার্যের মধ্যে। বুদ্ধিকে নানা ভাবে ভঙ্গিতে প্রেমের সেবায় কবিরা ব্যবহার করেছেন। শেক্সপীয়র, মিসেস ব্রাউনিং ন্যূনাধিক পরিমাণে বুদ্ধিটিকে নামিয়ে প্রেমের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন; প্রেমাবেগের বৈচিত্র্য খেলিয়ে তুলবার জন্য বুদ্ধির চাতুর্যকে তার মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন— আমাদের চণ্ডীদাসে বা বিদ্যাপতিতে পৌঁছে গিয়েছি আর-এক প্রান্তে যেখানে বুদ্ধির আলো প্রেমের মধ্যে প্রায় লীন হয়ে গিয়েছে। অন্য প্রান্তে উঠি যখন, বুদ্ধি ক্রমে আলাদা হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, প্রেমের অধিগত অধীন না হয়ে, প্রেমের সহযোগী— কমরেড— হয়ে উঠেছে, তার নিদর্শন ইংরেজ ডন (Donne)। কিন্তু প্রেমকে বুদ্ধির স্তরে তুলে ধরা, বুদ্ধিকে নামিয়ে নয়, প্রেমকেই তুলে ধরে বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিময় করে তোলা, প্রেমকে প্রেম রেখেই, তাকে শুধু একটা নৈর্ব্যক্তিক স্নেহস্নিগ্ধতায় পর্যবসিত না করে, এ ধরণের অবস্থান্তর বা রূপান্তর একান্ত দুর্লভ। হিমেনেথ যখন বলছেন— পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি :

> গোলাপের গোলাপী হৃদয় তৈরী হল
> ভগবান, তোমার আর আমার মধ্যে—
> তুমি চাও আমার জীবন
> আমি চাই তোমার জীবন—

কিম্বা

> চিন্ময় হে ভগবান, জগতের উপর তুমি এসে পড়েছ
> সারা মুখখানির উপর অনন্ত চুম্বন যেন এক—

প্রেমের সারাংশ ঘনীভূত হয়েছে মনে হয় জ্ঞান-গাঢ় চৈতন্যের মধ্যে। এ সম্ভব হয়েছে, কারণ বুদ্ধি বা মনঃশক্তিও উন্নীত হয়েছে এক অপরোক্ষ প্রতীতির মধ্যে। কাব্য-চেতনা কাব্য-রচনার উপর বুদ্ধি অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির প্রভাব ফরাসী কবিত্বের একটা বিশেষত্ব। অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে Valéryই এ ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন— হয়ত সে প্রভাব আতিশয্যের দিকেই ঝুঁকেছে। হিমেনেথও যে সর্বদা তাঁর উভয়পদী স্থিতিকে সর্বোচ্চস্তরে রাখতে পেরেছেন তা নয়— বুদ্ধি তার চাতুর্য দেখাতে

গিয়ে, সোনায় সোহাগা নয়, খাদে পরিণত হয়েছে। যা হোক, হিমেনেথের এই বুদ্ধিময়তাই খুব সম্ভব Valéryকে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর দিকে।

হিমেনেথ আমাকে আকৃষ্ট করেছেন, তাঁর বুদ্ধিগরিষ্ঠতার জন্য নয়, এমন কি তাঁর নিবিড় সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধি বা প্রেমতন্ময়তার জন্যও নয়— অন্ততঃ ততটা নয়, যতখানি তাঁর মন্ত্রশক্তির জন্য— অর্থাৎ তার উপচার-উপকরণকে তিনি দিয়েছেন একটা অপরূপ স্পষ্টতা, সংহৃতি, একটা নিরাভরণ পৌরুষ, প্রসন্ন-প্রখর তেজোময়তা, এবং অন্তঃশীল মাধুর্য।

DIOS, YO SOY LA ENVOLTURA DE MI CENTRO

DE TI DENTRO

কিম্বা

EL TODO ETERNO QUE ES EL TODO INTERNO

হিমেনেথের এ বাণীর মধ্যে আমি শুনি যেন দান্তে বা বেদব্যাসের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়েছে কোথাও। দান্তের:

In la sua volontade e nostra pace[১০]

কিম্বা

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate[১১]

আর বেদব্যাসের:

য ইমাম্ পৃথিবীং কৃৎস্নাং সংক্ষিপ্য গ্রসতে পুনঃ
হুতাশমীশং দেবানাং।

—নলোপাখ্যান[১২]

কিম্বা

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ।

—সাবিত্রী উপাখ্যান[১৩]

অবশ্য আধুনিকের চিন্তাঋদ্ধি যে রকম তাত্ত্বিক পর্যায়ের, প্রাচীনেরা তুলনায়

১০ তাঁরই ইচ্ছার মধ্যে আমাদের শান্তি।
১১ সব আশা ত্যাগ কর, কে তুমি এখানে আসতে চাও।
১২ এই সমস্ত পৃথিবীকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে গ্রাস করছে দেবতাদের রাজা যে হুতাশন।
১৩ পদ্মপলাশাক্ষী সে তার তেজে জ্বলছে যেন
সে তেজে প্রতিহত হয়ে কেউ তাকে বরণ করতে পারে না।

বস্তুতন্ত্র এবং বহিঃপ্রজ্ঞ— তা হলেও যে রীতি উভয়কে অনুপ্রাণিত করেছে তার মধ্যে রয়েছে একটা আনুরূপ্য। কবি তাঁর নিজের রীতি তাঁর অন্তরাত্মার ছন্দ সম্বন্ধে নিজে বলেছেন :

. The endless clarity of your beauty is,
as the sky in a fountain, limitless
Within the limitation of your borders[১৪]

হিমেনেথের স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা, ওজস্বিতা বা মন্ত্রশক্তির কথা বললাম। পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা তাঁর দিয়েছে এই গুণ। তবে যৌবনে তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে অনুভব-বিলাস বা হৃদয়ের উষ্ণতা যথেষ্ট ছিল তাঁর মধ্যে।৷ শুনুন তাঁর আকুলতা :

Leave the doors open,
This night, so that he,
If he wish, this night, may come,
Who is dead.
Open entirely,
To see if we may resemble
His body ; to see if we are
Something of his soul, being
Given up to space—[১৪]

কিম্বা আরো স্পষ্ট উদ্বেল কণ্ঠ

Whose is this voice ? Whence sounds
This voice, celestial and silvery
Which with delicate leaf pierces lightly
The iron silence of my pain—

প্রায় তিনি রোমান্টিক কবি হয়ে উঠেছেন— কিন্তু ভাবোচ্ছলতা তাঁর দৃষ্টিকে উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, তা রয়েছে তেমনি স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ; কারণ যৌবনের কামনার মধ্যেও স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত পরিণত বয়সের আস্পৃহা— তাঁর পরিণত বয়স হল যৌবনের পরিণতি।

১৪ W. S. Merwin -কৃত অনুবাদ।

প্রথম বয়সে ছিল

> There, within doors, before,
> The house was body
> And the body was soul

আর এখন

> Now on the path moving,
> The soul is a body,
> The house is the soul[১৫]

চৈতন্যের এই বিপ্লব ও বিপর্যয়ের উদাহরণ আমরা বহু সাধুসন্তদের জীবনে দেখে থাকি— অনেকেই বলেছেন— ভগবান তোমার খোঁজে বের হলাম, জগৎ ঘুরে এলাম— শেষে দেখি তুমি চিরকাল রয়েছ কাছে, অন্তরে, আমার আমিত্বের মধ্যে।

তবে হিমেনেথ যতই আধ্যাত্মিক হোন না কেন, তিনি আধুনিক। আধুনিকের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠা অহং— অয়মহং ভোঃ। দ্বিতীয়ত, অহমিকার সঙ্গে বাহ্যজগতেরও কামনা করা প্রতিষ্ঠা করা শাশ্বত প্রয়োজন হিসাবেই। আধুনিকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল আত্মবিরোধ আত্মদ্রোহ আত্মপীড়ন অন্তর্বেদনা মর্মযন্ত্রণা ('angst'—anguish)। হিমেনেথ আধুনিকের তিনটি বৃত্তিকেই অপরূপ রসায়নে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। অহংবোধ তাঁকে আত্মসচেতনতা দিয়েছে কিন্তু দেয় নি আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসর্বস্বতা। বৈষ্ণবের ভক্ত-প্রেমিকের একান্ত আত্মবিলুপ্তি নাই বটে কিন্তু প্রপত্তিসার আত্মসমর্পণ রয়েছে পূর্ণভাবে। জগতকে সৃষ্টিকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় অথচ অস্বস্তিকর সঙ্গী হিসাবে, অলঙ্ঘনীয় বিপত্তি হিসাবে স্বীকার করা গ্রহণ করা নয়, তাকে লাভ করা হয়েছে আপন অন্তরতম অঙ্গ হিসাবেই, তার নিভৃত সত্যকে ধরে। আর শোকের তাপের পারে তিনি চলে গিয়েছেন, কারণ তিনি তাঁর প্রাণকে সমর্পিত করতে পেরেছেন; অন্তরের অন্তরে, বাহিরেরও অন্তরে তিনি খোঁজ পেয়েছেন এক প্রেমাস্পদ সুন্দরকে, যিনি তাঁর কাব্যশ্রীর উৎস এবং জীবনবিভূতির অধ্যক্ষ। বুদ্ধির জিজ্ঞাসা ও

১৫ W. S. Merwin-কৃত অনুবাদ।

তর্কবৃত্তি তাঁকে শুষ্কতার দিকে, অপসিদ্ধান্ত বা অসিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় নি— কারণ তাকে তুলে ধরা হয়েছে অন্তর্হৃদয়ের সাক্ষাৎবোধ বা অনুভূতির মধ্যে— মনের অভিকল্পনের সঙ্গে রয়েছে যে 'হৃদিপ্রতীষ্যা'— হৃদয়ের প্রত্যক্ষ বোধ। কবির পক্ষে যতখানি সম্ভব, এইভাবে তাঁর চেতনা আর্ষ চেতনারই সমগোত্র হয়ে উঠেছে।

মালার্মের একটি কবিতা

কিন্নরের দিবাস্বপ্ন

এই যত অপ্সরা, এদের ধরে রাখব আমি চিরকাল।

কি স্বচ্ছ এদের লঘু রক্তরাগ, নেচে চলেছে ঘনবিন্যস্ত ঘুমে মগ্ন
বাতাসের কোলে।

স্বপ্নকে তবে ভালবেসেছি ?
পুঞ্জীভূত প্রাচীন রজনী যেন এই আমার সংশয়, তা শেষ হল—
মিলিয়ে গেল অসংখ্য শাখারাজির তনুরেখায়—
তারা হয়ে উঠল সত্যকার তরুরাজি।
রূঢ়ভাবে প্রমাণ করে দিল তাতে
আমি যে বিজয়ের গর্ব করেছি তা হল পাপের গোলাপী কল্পনা আমার

ভাবি তবে একটু…

এই যে মেয়েদের মধুর ছবি দিয়েছ তুমি
তা তোমারই রূপাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রিয়ের কামনাকে মূর্ত করে ধরেছে—
এ দৃষ্টিভ্রম তোমার, কিন্নর, উৎসারিত
উভয়ের মধ্যে শুদ্ধতরা যে তার হিমনিথর নীল আঁখি হতে।
কিন্তু অপরটি শুধু দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তৈরী,
তুলনায় সে তবে কি তোমার প্রতি রোমকূপে ঢেলে দিয়েছে
তপ্ত দিনের হাওয়া !
কিন্তু তা ত নয় !
এ যে স্থির শ্রান্ত বোধহারা তন্দ্রা,
তার উত্তাপে স্নিগ্ধ ভোরের প্রয়াস মাত্রেরই কণ্ঠরোধ করে রেখেছে—

এখানে কলকণিত জলধারা নেই—
যদি থাকে তা হল আমার বাঁশী ঢালছে বনস্থলীর উপর যে সুরের ধারা।
আর যে হাওয়া বইছে
তা শুধু আমার নল দুটি হতে নিঃসৃত,
যতক্ষণ না তাতে সুর ছড়িয়ে যায় বিশুষ্ক ধারায়,—
সেই যে শিল্প-প্রেরণার প্রশান্ত ছন্দ সাক্ষাৎ উঠে চলেছে ফিরে তার স্বর্গে,
দূর নিস্তরঙ্গ দিকচক্রবালের কোণে
সিসিলিদেশের প্রান্তে প্রশান্ত জলাভূমি—
সূর্যকে পর্যন্ত হারিয়ে দিয়ে আমার গর্বিত দৃষ্টি তাকে লুণ্ঠন করে চলেছে,
হতবাক্ সে পড়ে রয়েছে তারকারাজির ফুল্লিত স্ফুলিঙ্গের তলে।
বর্ণনা করো তাহলে :
"আমি এখানে কেটে কেটে তুলছিলাম শূন্য বেণুদণ্ড,
আমার শক্তি যাদের পোষ মানিয়েছে,—
তখন হঠাৎ দেখলাম কি, ঐ যে দূর সবুজরাশি
তার দ্রাক্ষাকুঞ্জ সব নিবেদন করে দিয়েছে প্রস্রবণের পাশে পাশে
সেই সবুজেরই ঘোলাটে সোনালীর 'পরে ঢেউ দিয়েছে বিশ্রান্তিমগ্ন

জীবতনু-শুভ্রতা :

আমার বেণুতে মাত্র সুর দিয়েছি কি উড়ে গেল,
না ডুবে গেল— হংসশ্রেণী ? না, না, অপ্সরা…"

রুক্ষবেলায় জড়িমার আবেশে দগ্ধ সব—
তাতে কোন নিশানা দেয় না,
কোন যাদুতে 'সা' না সাধতেই আমার অদৃশ্য হয়ে গেল এতখানি ভোগসূত্র।
যাক, তাহলে জেগে উঠি এখন আদিম প্রেরণা নিয়ে,
জাগ্রতের প্রাচীন আলোধারার তলে সোজা উঠে দাঁড়াই একা—
হে কুমুদ ! তোমাদেরই একজনের মত হয়ে,
সকল সারল্য নিয়ে।

এই যে মধুর তুচ্ছ বস্তুটি তাদের ওষ্ঠাধরে গরবে স্থান পেয়েছে,

যা দিয়ে পরস্পরকে তারা অন্তরালে প্রতারণা করে আত্মতৃপ্ত—
চুম্বন যার নাম সে ত এ নয়—
আমার বুক ছিল নিষ্কলঙ্ক—
কিন্তু এ কি, তার উপর কোথা হতে এল কোন অপৌরুষের এ দন্তচিহ্ন।
চুপ, চুপ! এমন রহস্যময় ব্যাপার মুখ ফুটে বলা চলে কাউকে?
বলতে পারি এক আমার এই দোনলা বাঁশীর কুহরে,
নীল আকাশের তলে।
এই উদার বাঁশীই নিজের উপর টেনে নিয়েছে আমার কণ্ঠের আর্তি,
তার নিঃসঙ্গী স্বরের দীর্ঘ তানে চলেছে স্বপ্ন দেখে—
জাগ্রতের সৌন্দর্যে আর গানের স্বচ্ছন্দ মায়া-রচনায় মিলিয়ে একটা মিথ্যা
অভিনয়ের রসিক হয়ে
মুদ্রিত নয়নে আমরা অনুসরণ করি বক্ষের নিতম্বের যে ধ্যানরূপ তাকে—
প্রেমাবেগের নামকে—
শূন্যগর্ভ রেখার টানে মন্দ্রিত বলয়িত করে।

কামরূপী চতুরিকা বাঁশী-সুন্দরী, তবে তুমি আবার ফিরে যাও,
জলের ধারে গিয়ে ওঠ ফুটে অপ্সরামূর্তি নিয়ে—
আমার জন্যে সেখানেই ত তুমি অপেক্ষা কর।
আর আমি এদিকে পারি যতক্ষণ
সগর্বে সরবে দেবীদের কথা বলতে থাকি,
বলি পটে আঁকা ছায়ামূর্তিদের নীবীবন্ধ সঙ্কলনের কথা।
সেই রকমেই ত আঙুরের আলোর সার চুষে নিয়ে,
পাছে দুঃখ হয় তাই করি কি
হেসে হেসে ছলভরে তার স্বচ্ছ খোসাটি ফুঁ দিয়ে বাতাসে পুরে দিই
আর তার দিকে তাকিয়ে থাকি স্বপ্নমশ্‌গুল হয়ে—
সন্ধ্যা অবধি।

অপ্সরা সব! আবার তবে ফাঁপিয়ে তুলি স্বপ্নকথা:

"আমার দৃষ্টি নলবন ভেদ করে বিদ্ধ করেছে গিয়ে প্রত্যেকটি
অপ্সরার স্কন্ধভাগ—
যখন আকাশস্পর্শী এক চীৎকার ক'রে জলতলে তাদের দাহন ডুবিয়ে ধরে ;
আর তাদের কেশদাম অদৃশ্য হয়ে যায় প্রোজ্জ্বল অভিষেকের
মুক্তাচূর্ণ ঝলকে আলোকে।

ছুটে আসি আমি।
দেখি পায়ে জড়িয়ে গিয়েছে দুটি ঘুমন্ত দেহ,
তাদের যদৃচ্ছান্যস্ত বাহুপাশে এলায়িত,
প্রণয়বন্ধের রসাবেশে মর্দিত বিক্ষত :
দু'জনকেই আমি আলিঙ্গনে ধরি—
তাদের পৃথক করে দিয়ে নয়, ছাড়িয়ে নিয়ে নয়—
নিয়ে ছুটে চলি ডাঙায়, নাই যেখানে চটুল ছায়া,
যেখানে গোলাপের স্তূপ তাদের সৌন্দর্য হারায় সূর্যের উত্তাপে,
সূর্যতাপে দগ্ধীভূত দিনেরই মতো যেখানে আমাদের সম্ভোগ।"
সত্যি ত, আমি ভালবাসি কুমারীর ক্রোধ— কি উন্মাদন,
কৌমার্যের নগ্নদেহভার যখন গুণ্ঠিত হয়ে যায় লেলিহান অগ্নিশিখায়
আমার ওষ্ঠাধরস্পর্শে,
কম্পিত হতে থাকে বিদ্যুৎ-চমকের মত :
দেহে রয়েছে কি গোপন আতঙ্ক,
কঠোরার গুল্‌ফ থেকে ভীরুটির হৃৎপিণ্ড অবধি ছেয়ে—
দুজনেই কিন্তু একসঙ্গে হারিয়েছে তাদের সহজ সারল্য—
উদ্বেল বৃথা অশ্রুধারায় হোক নাতিবিষণ্ণ অন্য কোন ঝাপটায় হোক সিক্ত হয়ে।
"কিন্তু আমার ভুল হল,
বিশ্বাসঘাতক ভীতিস্থানকে আমি জয় করলাম বটে
কিন্তু বিজয়ের পুলকে পৃথক করে দিতে গেলাম
দেবতারা এমন একসঙ্গে মিশিয়ে চেয়েছে উদ্ভ্রান্ত চুম্বনের
যে জটিল সমাহার তাকে।
এক দিকে একটিরই ফুল্ল কেশদামের তলে আমি আমার
কামদীপ্ত হাসির কণ্ঠরোধ করেছি,—

(অন্য দিকে দ্বিতীয়টির একটি আঙুল ধরে রয়েছি—
ছোটটি, সরলা অনারক্তকপোলা যেটি—
যাতে তার শুভ্রশুচিতাও তার দাহ্যমান সোদরার প্রাণাবেগে
রাগরঞ্জিত হয়ে ওঠে)
কিন্তু হঠাৎ কেমন এক নির্বাণের ফলে
বাহু আমার শ্লথ হয়ে পড়ল,
পালিয়ে গেল আমার শিকার— অকৃতজ্ঞ, অকরুণ—
আমার রোদন আবেশ ভ্রূক্ষেপ না করে।"

যাক ওসব! আরো ত অনেক আছে,
তাদের অলকদামে আমায় বেঁধে নিয়ে চলবে মহাসুখের দিকে।
তুমি ত জান, হে আমার চিত্তাবেগ, ডালিম যখন লাল হয়ে পেকে ওঠে,
আর যেই ফেটে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা এসে রোল তুলে দেয়—
আর আমাদের ধমনীর রক্তও একবার মত্ত হয়ে ওঠে যখন
যে-কারো স্পর্শে তখন ছোটে সে কামনার অফুরন্ত ইন্ধনরাশির উদ্দেশে।
ওই দেখনা বেলা গেল,
সবুজ বনরাজি সোনায় সোনা— ভস্মধূসর,
পত্রপুঞ্জের আড়ালে জ্বলে মহোৎসব।
আগ্নেয়গিরি! তোমারই কোলে নেমে এসেছে শুকতারা—
তোমার উষ্ণ ধাতুস্রাবের উপর তার পা ফেলে,
ঘুমের ঘোর মন্দ্রিত হয়ে ওঠে যখন,
আগুনের শিখা নিবে যায় যখন।
এবার তবে ধরেছি প্রেমরাণীকে!

এবার শোধবোধ নিশ্চয়···

না, বাক্‌রহিত প্রাণ,

ভারজর্জর দেহ মধ্যাহ্নের রুদ্র নিস্তব্ধতায় অভিভূত।

ভুলে যাই মান অপমান, এখন কেবল ঘুম ;
শুয়ে পড়ি তবে তৃষ্ণাতুর বালুকাশয্যায়—
মুখ খুলে পান করি তারার উগ্র মাদক আলো।

বিদায়, কন্যা-যুগল ;
ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছ তোমরা, তাই দেখি আমি।

বিশদার্থ

এক কিন্নর অপরাহ্ণ-নিদ্রায় আরাম করছে। আমি বললাম 'কিন্নর', মূলে আছে 'ফন' (Faun)— গ্রীক দেবগণের অন্তর্গত, দেবগণ কিন্তু তার আবার আছে শিং, লাঙ্গুল এবং লোমশ দেহ ; রাখালদের প্রিয়, সহায় এবং রাখালদের মতই সংগীত-প্রিয় (বেণুবাদক) সে। কিন্নরের চেহারাও অর্ধ নর-পশু— তারাও সঙ্গীতভক্ত। কিন্নর শুয়ে আছে এক বনে গাছপালার নীচে— বালুর উপর, চারিদিক সূর্যতাপে দগ্ধ। এই প্রচ্ছদপট কবিতাটির শেষ দিকে আছে।

প্রথম দৃশ্য বা ছন্দ :

কিন্নর জাগছে ধীরে ধীরে। স্বপ্ন দেখছিল অপ্সরাদের (Nymph) সম্ভোগলীলা। ভাবছে এ যদি সম্ভব হত। চোখ মেলছে, তবুও ত স্বপ্নদৃষ্ট নারী-অঙ্গ বাস্তব তরুলতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বুঝি। নাঃ, আর তাদের দেখা যায় না— সবুজ শাখাপ্রশাখাই রয়ে গেল, স্বপ্ন অলীক চিন্তা মাত্র।

অথ স্বপ্ন-বিচার। কি স্বপ্ন দেখছিলাম? দুটি অপ্সরা। একজন নীলনয়নী, শীতলা নির্মলা— কোথা থেকে এল এ মায়াছবি? নিশ্চয়ই ঝরণাপ্রবাহের দৃশ্য থেকে। আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘশ্বাসে তৈরী যেন— অর্থাৎ হাওয়া আমার রোমরাজির ভিতর বয়ে চলেছে সেই স্পর্শ থেকে এ-ভ্রমের উৎপত্তি। নাঃ, তা হতে পারে না। এখানে জল কোথায়, হাওয়া কোথায়। সব ঊষর, শুষ্ক। এখানে জলের শব্দ নাই, শব্দ ঢালছে আমার বেণু— আর যে হাওয়া বইছে তা হল ঐ বেণুরন্ধ্রমধ্যে আমার ফুৎকার, আমার সঙ্গীত-প্রেরণা ঊর্ধ্বগামী প্রবেগ।

তাহলে স্বপ্নটাকেই স্বরে ফুটিয়ে ধরি :

দ্বিতীয় দৃশ্য বা ছন্দ :

জলের ধারে নলবনে আমি বেণু কাটছিলাম— বাঁশী তৈরী করব বলে। হঠাৎ দেখি দূরে সোনালী সবুজের উপরে একখানি জীবন্ত দেহ দুলছে। বাঁশীতে আমি সুর তুলেছি কি উড়ে গেল হংসশ্রেণী ; না, পালাল কি উড়ে গেল অপ্সরার দল।

কিন্নর দেখল কিছু নেই, আছে চারদিকে অপরাহ্নের স্তব্ধতা আর দাহ্যতা। মনে করল, বেশ, তবে উঠে বাঁশীটা বাজানই যাক।

তৃতীয় দৃশ্য বা ছন্দ :

কিন্তু এ কি! কিন্নর বুকের উপর দেখছে কি? দংশনচিহ্ন? তা যদি হয় তবে স্বপ্ন সে দেখে নি— বাস্তবই তা। চুম্বনের রেখা থাকে না, উঠে যায় ; কিন্তু দংশন ত আর মায়ার পর্যায়ে নয়। না, মায়া বটে, দংশনের দাগ কিছু নেই।

এবার গাওয়া যাক— সুরের এ কুহক আছে— সুরের রেখায় গড়ে তোলে, চোখের সামনে ধরে দেখায়, স্থূল শারীর বন্ধ ; ধ্বনির শূন্যগর্ভ টানে টানে বলয়িত হয়ে ওঠে পিঠ পেট···

সুরের খেলাতেই তবে ফুটে উঠুক আমার প্রেমলীলা, স্মৃতিপটে জ্বলে উঠুক আনন্দের সম্ভোগের চিত্র সব।

চতুর্থ দৃশ্য বা ছন্দ :

কি দেখছিলাম?— অপ্সরারা পালাল। পালাল? মোটেও না। আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়েছে দু'দুটি অপ্সরা— দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। দু'জনকেই তুলে নিলাম, দু'জনকেই আলিঙ্গনে ধরলাম। কিন্তু কি জানি কি হল, নিভে গেল মরে গেল তাদের মধ্যে একজন, অপ্সরা দুটিও কোন্ ফাঁকে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য বা ছন্দ :

কিন্নর নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। দুটি অপ্সরা যেন পালাল, আরো কত কত রয়েছে যারা আমার অপরিসীম ক্ষুধার আহার যোগাবে। এই দেখ না কে

আসছে ঐসব জ্বালিয়ে উজ্জ্বল করে— শুকতারা মূর্তি নিয়ে স্বয়ং রতিদেবী— তাকেই আমি ধরেছি। প্রতিশোধ এবার···

মন্তব্য

মালার্মে কবি বটে, কিন্তু একটু অসাধারণ রকমের। তাঁর পদ্ধতিতে রয়েছে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কল্পনার আশ্রয়ে কিছু উদ্ভাবন করে, ভাবনার চিন্তার ক্রম ও সুসঙ্গতি ঠিক রেখে বা নিছক খেয়াল অনুসারে যে তিনি রচনা করে চলেন তা নয়। ফলতঃ তিনি কিছু গড়েন না, একটা গঠিত জিনিসকে তিনি শুধু ধরে দেখাতে চেষ্টা করেন। বলতে পারি তাঁর মন্ত্র হল— যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং। তিনি অন্তশ্চক্ষে দেখেছেন একটা ছবি, মানসপটে ভেসে উঠেছে একটা দৃশ্য, তাঁর সকল কৌশল তাকে যথাযথ নকল করা, বাক্যের সহায়ে। বস্তুত আমাদের প্রাচীন ঋষিরা কবির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতেও এই কথা পাই— কবয়ঃ সত্যদ্রষ্টারঃ— সত্যকে যাঁরা চোখে দেখেন তাঁরাই কবি, সত্যকে গড়া তৈরী করা রচনা করা তাঁদের কাজ নয়, যে সত্য আছে পূর্ণাঙ্গ নিয়ে তাকে দেখা ও প্রতিফলন করাই হল কবির সমস্ত কবিত্ব— যে যত হুবহু প্রতিফলন করতে পারবে সে তত চমৎকার কবি।

ফলতঃ কবি কেন, শিল্পী মাত্রই এই পথে চলেন— যাঁরা অসাধারণ শিল্পী বা শিল্পীশ্রেষ্ঠ। বধির বেট্‌হোফেন অন্তঃশ্রবণে শুনেছেন যে ধ্বনি-লহরী তাই ত তিনি ফুটিয়ে ধরেছেন স্থূল শব্দে। অন্ধ মিলটন অন্তশ্চক্ষে দেখেছেন যে লোকান্তররহস্য, আন্তর শ্রবণেও শুনেছেন যে তরঙ্গিত বাণী তাই ত তিনি স্থূল অক্ষরমালার মধ্যে শরীরী করেছেন। উপনিষদের অনুসারে ঋষিরাও তাই করেন, তবে আরো গভীরভাবে সমুচ্চভাবে— তাঁরাও দেখছেন চক্ষুর চক্ষু দিয়ে, শুনছেন কর্ণের কর্ণ দিয়ে।

মার্লামের আরো বিশেষত্ব এই যে দৃষ্টবস্তুর যে অনুলেখন তিনি দিয়ে থাকেন তা হল দৃশ্য-পরম্পরা অর্থাৎ মুখ্যদৃশ্য, যার বৈশিষ্ট্য বিশেষ অর্থ বা ব্যঞ্জনা তিনি দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টিকে যা আকৃষ্ট করেছে সেইগুলি তিনি একটির পর একটি দিয়ে চলেছেন, তাদের সংযোগসূত্রের ক্রম-পরিণামের ধারা-বাহিকতা তিনি অনুসরণ করেন নাই, পারম্পর্যের মধ্যে ফাঁক রয়ে গিয়েছে—

সিনেমা ফিল্মের ফটোগুলির পারম্পর্যে যদি অতিরিক্ত ছেদ থাকে তবে যে রকম হয়। এই কারণে অর্থের দিক দিয়ে মালার্মের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুরূহতা দুর্বোধ্যতা। পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য তার যথাযথ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিন্যাস-সহ এঁকে দেখান নি— ক্লাসিকাল শিল্পীরা যেমন করে থাকেন। বিষয়ের, বস্তুর তিনি দেখান এখানে ওখানে কয়েকটি প্রত্যঙ্গ মাত্র— অবশিষ্ট আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এই পর্যায়ে মালার্মের দুটি কবিতা বিখ্যাত—একটি Le Cygne। এ কবিতাটি সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি, আমার 'শিল্প-কথা'য়— এখানে দিয়েছি দ্বিতীয়টি—দীর্ঘতর কাহিনী এক, এবং সুপরিচিত। অনুবাদের পরে সঙ্গে ব্যাখ্যাও দিয়েছি। এই কবিতাটির অনুবাদ কবি সুধীন্দ্রনাথও করেছেন তাঁর 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্থে।

কবি সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথকে বলা হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি ও মনীষী। কিন্তু কাকে বলি রবীন্দ্রোত্তর যুগ? রবীন্দ্রনাথের পরে একটা ভিন্ন যুগ এসেছে, কিন্তু কি রকমে ভিন্ন? পূর্বাপরের মধ্যে কোথায় সীমানা? সীমানা আমরা নির্দেশ করতে পারি এই রকমে— মানুষের আছে দুটি ভাগ— ঊর্ধ্ব আর অধঃ— একটা চলেছে উপরের দিকে, আলো আনন্দ আস্তিক্য বা অধ্যাত্মের দিকে, আর-একটা চলেছে নীচের দিকে, অন্ধকার দুঃখ সংশয় বা জড়বস্তুর দিকে; এই দুয়ের মাঝে যে সীমানা, যে স্থিতি বলা যেতে পারে তাই রবীন্দ্রনাথ। এ যেন যাকে ভূগোল বলে স্রোত-বিভাজক (watershed)— একটা উঁচু পাহাড়িয়া সীমানা যার এক দিকে বয়ে নেমে যায় কতকগুলি নদী আর অন্য দিকে বিপরীত মুখে বয়ে যায় আর কতকগুলি। রবীন্দ্রপরবর্তী চেতনার সাধারণ মোটামুটি ধর্ম আমরা বলতে পারি এই যে তা আপনাকে মানব-চেতনার ঊর্ধ্বভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন— যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে; হয় ভুলে গিয়েছে, নয় অস্বীকার করেছে, নয় তার উপর আবরণ টেনে দিয়েছে। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী চেতনা পক্ষান্তরে যথাসম্ভব— এখানেও যথাসম্ভব একটা সংযোগ রেখেছে উপরের বস্তুর সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য উভয় রকমের উদাহরণ পাওয়া যাবে, কিন্তু আমি বলছি একটা সাধারণ প্রাধান্যের কথা। এ কথাটি মনে রাখলে সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় কিছু পরিষ্কার বোঝা যাবে।

আধুনিক কবিচেতনার মর্মবাণী, বলতে পারি আধুনিক মানবচেতনারই মর্মবাণী, এক কথায় যা প্রকাশ করা যেতে পারে, তা হ'ল—

De profundis clamavi

'অতলে পড়ে গিয়ে কেঁদে মরি আমি'

('ভগবান'— Domine কথাটা সেই সঙ্গে কেউ জুড়ে দেন বা দেন না, রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে), কিন্তু কি অতল সেটি? তলায় মানুষ চিরকাল পড়ে গিয়েছে, আবার উঠেছে— তা-ও নূতন কিছু নয়। কিন্তু আজকের তলার বিশেষত্ব আছে, তা সত্যই অতল। তার মনস্তাত্ত্বিক বা মর্মান্তিক

স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে পাশ্চাত্যেরা— জর্মন দার্শনিকেরা তার নাম দিয়েছেন Ang-t (anxiety বা anguish -এর চেয়েও কড়া জিনিস একটা)। বাংলার কাব্যাকাশেও অনুরূপ ধ্বনি শুনতে পেয়েছি— বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রতিধ্বনি মাত্র, কৃত্রিম কণ্ঠ, কিন্তু তার মধ্যে সুধীন্দ্র দত্তর কণ্ঠ বহুলাংশে আন্তরিক। কি তবে কথাটা ?

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

আরো শুনুন কথাটা :

মনে হলো আশা নাই
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার
মনে হলো
সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হলো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এতকাল ধ'রে
কৃপণের ভাঁড়ারে ভাণ্ডারে ;
এইবার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে ;

নরক বটে। কিন্তু এ নরক বাহিরে নয়, অন্তরে, চেতনায়, মর্মে-মর্মে। তা শুধু মানসিক বিকার বা বৃত্তি মাত্র নয়। মনের মধ্যে, চিন্তায় নরকভোগ মানুষের সাধারণ ও সনাতন অবস্থা। সে রকম দহরে পতন আদম্‌-ইভ থেকে সুরু করে আধুনিক De Profundis-এর কবি (Oscar Wilde— *Ballad of the Reading Gaol*) পর্যন্ত বহু মানুষের ভাগ্যে ঘটেছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আজকাল যে নরকদর্শন আমাদের তা অন্য এক জিনিস। মনে অর্থাৎ উপরের বুদ্ধি বা চিন্তা বা ভাবের স্তরে নয়, এ হ'ল সত্য সত্যই সত্তার অধঃপতন অবতরণ, অবচেতনার বা নিশ্চেতনার মধ্যেও, দেহগত একটা পর্দার অন্তরালে মানুষ যেখানে শুধু অন্ধ অজ্ঞান নয়— কুৎসিত আর বীভৎস,

শুধু দীন নয়, হীন ও হেয় হয়ে গিয়েছে। মানুষের আদিপুরুষ কর্দমচারী কৃমিকীট, পচা গলা আহার্যের মধ্যে তৃপ্ত যত জন্তু জানোয়ার, চেতনা যেখানে যত অন্ধকার যত সঙ্কীর্ণ যত খণ্ডিত যত চূর্ণিত হতে পেরেছে, মানুষ এখনও সে-সব বয়ে নিয়ে চলেছে তার রক্তকণায়, তার প্রতি কোষে; আপন দেহায়তনে এই যে তার উত্তরাধিকার— এতদিন যে বিস্মৃত ছিল তার সম্বন্ধে, যেন বিদেশে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণবিহারে বহির্গত হয়ে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসে সজ্ঞান হয়েছে নিজস্ব সম্পদ সম্বন্ধে। ফরাসী কবি বোদেলের একদিন এই ধরণের অনুভূতি ও বার্তা নিয়ে এসেছিলেন— আধুনিকের তিনিই হয়ত আদিপুরুষ ও অগ্রণী। তিনিও এসে পৌঁছেছিলেন Cytherea দেশে— নামে তা সৌন্দর্যের দেশ, ভিনস্ দেবীর জন্ম ও লীলাভূমি— কিন্তু তাঁর চোখে কি দৃশ্য নিয়ে এল?

হিংস্র পাখীরা সব বসে আছে তাদের শিকারের উপর,
উন্মত্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন করছে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো একটা প্রায়-পচা শব
প্রত্যেকে তার অশুদ্ধ ঠোঁটটা ছুঁচের মত বিঁধিয়ে চলেছে তাতে,
এই গলিত বস্তুটির রক্তাক্ত প্রতি কোণে কোণে…

দেবী ভিনাস্! তোমার দ্বীপালয়ে দেখলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে
একটা অলৌকিক ফাঁসিকাষ্ঠ, তাতে ঝুলে রয়েছে আমারি প্রতিচ্ছায়া…
ভগবান! ভগবান! শক্তি দাও, সাহস দাও
আমি যেন নিজের হৃদয় নিজের দেহ তাকিয়ে দেখতে পারি ঘৃণা না করে![১]

কিন্তু এই কি শেষ, সর্বশেষ? একটা মহতী বিনষ্টি ছাড়া গত্যন্তর নাই? সত্য সত্যই

এইবার ফুরায়েছে পালা…
এলো সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ;

১ De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tons les coins saignants de cette pourriture . . .

Dans ton île, ô Vénus! je n'ai trouvé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image . . .
—Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!
Un voyage à Cythère—C. BAUDELAIRE

দিনান্তের মুমূর্ষু বর্তিকা
প্রাকনির্বাপণ দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত করিল সহসা
প্রাণের অন্তিম শক্তিব্যয়ে ;
তার পর অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিল শবপ্রাবরণী।

বোদেলের যে অপ্রতিষেধ্যের কথা বলেছেন (L'Irrémédiable) এ কি তাই? মানুষের ভাগ্যগতির চিত্র বোদেলের কি রকম দিয়েছেন দেখুন একটু :

নরকদণ্ডে দণ্ডিত সে নীচে নেমে চলেছে, আলো নাই হাতে,
একটা অতল গহ্বরের পাশ দিয়ে, তার দুর্গন্ধ
জানিয়ে দেয় রয়েছে সেখানে একটা সিক্ত অতল
আর সিঁড়ি যে নেমে গিয়েছে, তার শেষ নাই,
ধরবার মত অবলম্বনও নাই—
এ হল অপ্রতিষেধ্য ভাগ্যের নিখুঁৎ চিত্র—
তাতে মনে করিয়ে দেয় শয়তান যা করে
তা আধখানা করে রাখে না কখনো।[২]

কিন্তু বোদেলেরই বলেছেন আবার, এই যে নরকাশ্রয়ী জীব, অর্থাৎ আমি,—কে সে? সে-হ'ল

একটা ভাব একটা জীব
সুনীলিমা থেকে নেমে এসেছে, পড়েছে গিয়ে
একটা কর্দমাক্ত নিরালোক গহ্বরে,
সে হল দেবতা (এঞ্জেল) একটু দুঃসাহসবশতঃ
চলে এসেছিল বিকৃতির উপর ভালবাসার ফলে![৩]

২ Un damné descendant sans lampe,
Au bord d'un gouffre dont l'odeur
Trahit l'humide profondeur,
D'éternels escaliers sans rampe . . .
—Emblèmes nets, tableaux parfait
D'une fortune irrémédiable,
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu'il fait!

৩ Une Idée, une Forme, un Être
Parti du l'azur et tombé

বোদেলের অনেকখানি গভীর রহস্যের কথা বলে ফেলেছেন। কিন্তু এখানে আমরা কথাটি আর-এক দিক দিয়ে দেখব।

সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় বলছে মানুষের মধ্যে একটা চেতনা বা বৃত্তি -বৈপরীত্য থাকবেই (polarity of consciousness)। চেতনার ধর্মই এই—এ হল যেন মনোময় ক্ষেত্রে নিউটনীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম প্রয়োগ। নিছক ভাল মানুষ নাই, নিছক মন্দ মানুষ নাই, ভালমন্দ নিয়ে মানুষ ; শুধু তাই নয়, ভাল ও মন্দের ভাগাভাগি একেবারে সমান। যে যত বড় অবিশ্বাসী তার ভিতর তত বড় বিশ্বাস লুকিয়ে আছে, যে যতখানি নাস্তিক, তার মধ্যে আস্তিক্য ঠিক ততখানি রয়েছে গুপ্ত। বাহিরে যে যত দুঃখী ও হতাশ, অন্তরে তার কোথাও নিহিত সুখের ও আশার ফল্গু। বোদেলের অন্ধকারের বীভৎসের কুৎসিতের জীবন্ত জাগ্রত এমনকি ন্যক্কারজনক চিত্রও দিয়েছেন— কিন্তু আসলে তিনি আলোর সুন্দরের পূজারী ও কবি এবং আলোর ও সুন্দরের এত বড় পূজারী ও কবি যে তাঁর তুলনা খুব অল্পই মিলে। সে যা হোক বাঙালী কবি সুধীন্দ্রনাথও মনে হয় এই রকম বর্ণচোরা কবি অর্থাৎ যেটা ভাণ তিনি করছেন সেটা হল পোষাক বা আবরণ মাত্র, অন্য একটা সত্যকে স্ফুটতর করে ধরবার জন্যেই। খুব স্পষ্ট করে, ফরাসী কবিটির মতনই জ্বলন্ত করে, আবরুহীনভাবে উচ্চকণ্ঠে বলছেন বটে :

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর।

এর একটু আগে আরো বলেছেন :

অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত মিনতিরে ;
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে

Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul oeil du Ciel ne pénètre ;
Un Ange, imprudent voyageur
Qu'a tenté l'amour du difforme—
L'Irrémédiable—C. BAUDELAIRE

মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডুক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড় ॥

ক্রোধে ক্ষোভে শ্লেষে ব্যঙ্গে তিনি অগ্রজের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে উঠেছেন ভগবানকে ডেকে :

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈত্রিক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি ক্রীত, পদানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
... ...
ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,

আমি বলি এত যে আবিল উদ্বেল বিদ্রোহ, এ হল মূলতঃ অভিমান, গাঢ় ঘোর অভিমান। এ রকম করে ডেকে লড়াই ঘোষণা করতে পারি কেবল তারই বিরুদ্ধে যার অস্তিত্ব আমি বোধ করছি অভ্রান্তভাবে, কোথাও যার অস্তিত্বের কোন বোধই নাই তার সম্বন্ধে আসে শুধু উদার ঔদাসীন্য, অপার অমনোযোগ।

এ অভিমান পরে একটা রূঢ় রুক্ষ প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে খুব সম্ভব। উত্তীর্ণ-পঞ্চাশে কবি বলেছেন তাঁর অবস্থা (যযাতির মুখ দিয়ে) এই রকমের :

নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—
অপ্রাপ্তসৎকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—

কিন্তু উত্তর-চল্লিশেও স্বপ্ন দেখছেন কবি, স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতাও রেখেছেন— আস্তিকেরাও তেমন স্বপ্ন দেখে কি না সন্দেহ :

কিন্তু তার দিব্য আবির্ভাবে
প্রেতার্ত অভাবে
জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয় ;
ক্লেদ-মেদ-খেদের আলয়—
জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল
সংসক্ত থাকে না আর ; তন্মাত্রাসম্বল
হয় তনু আচম্বিতে।
নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে, ...

আরো কি সুন্দর দর্শন :

শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন,
দুরাক্রম্য নয় গিরিচূড়া,
পরিস্রুতসুরা
নিদাঘের অফুরন্ত দিন,
সুবর্ণধারার শষ্পশ্যামল পুলিন

আর তারো আগে যৌবনে কবি যে বিদেশিনী মহাশ্বেতার স্বপ্ন দেখেছেন সে কি কেবলি মানবী ? আমি তাকে অনুভব করি উর্বশীর সগোত্র বলে :

যে-অপূর্ব্ব জপমন্ত্র কানে মোর নিবিড় সোহাগে
দিলো চিরসুন্দরের দূতী,
ভ'রে ওঠে পরিব্যাপ্ত নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি
সে-প্রণাদ অনুলাপ।
বক্ষে কাঁপে
কী এক বচনাতীত তীব্র সংবেদন।

আরো :

শুনি যেন আমি,
দেখি যেন মুদ্রিত নয়নে,
ক্ষণে ক্ষণে
মহাকাল-হস্ত-চ্যুত অপ্রচুর অন্তিম নিমেষ

হয়ে যায় নিরুদ্দেশ
প্রতিধ্বনিপরিপূর্ণ বিস্মৃতির অতল পাতালে

হেন কালে
অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
আচম্বিতে তুমি এসে প্রবেশিলে প্রেতপূর্ণ গৃহে।

শুনুন শুনুন কবির নিভৃত আস্পৃহা— কতখানি গাঢ়স্বরে, কতখানি আন্তরিকতা নিয়ে, কতখানি সুচারু ভঙ্গিমায় কবি বলছেন :

তারি তরে
উৎসুক প্রত্যাশা মোর শূন্য দিগন্তরে
নেহারে অস্থির মরীচিকা।

প্রসঙ্গতঃ বলি কথা কটি দান্তের মহাকাব্যের মত পাথরে উৎকীর্ণ— সংহত, সুষীম সুদৃঢ় করে। কবি বলছেন আরো :

তাই মোর প্রজ্জ্বলিত যৌবনের যজ্ঞাগ্নি মহান
রিক্তাকাশে
প্রসারে কম্পিত বাহু অনামিক দেবতার আশে।
সে-চির অচেনা,
জানি জানি, কোনোদিন আমার হবে না ;
তবুও নিশ্চয়
আমার উদ্যত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমার লাগি নয়॥

দেখছি না কি যে-রাবীন্দ্রিকতার বিরোধী হয়ে কবি দৃপ্তবেগে উঠেছেন, সেই বস্তুটিই তাঁর প্রাণের মধ্যে কতখানি লুকিয়ে ও মিশে রয়েছে ?

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকোচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে

মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।

সুরের মধ্যে ভঙ্গিমার মধ্যে শুনি না রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি কিছু? অথবা :

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে?
তোমার অতল, কালো, অতনু আঁখিতে
তারকার হিমদীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মুখে।

এ হল সুধীন্দ্রনাথের পরমং পদং -এর নমুনা।— আরো :

কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারই প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান ॥

অর্কেস্ট্রার কবির তো কথাই নাই— এ সুরে ভাবে মশগুল তিনি— এই যেমন :

আগত আগত উদার সবিতা, প্রাচী রঞ্জিত রাগে
উত্তর দক্ষিণ····· অস্তদিগন্তে লাগে আশীষ লাগে।
চিরপরিচিত গৃহশিখরে
কুহক-কণক-কণ ঠিকরে ;
ধূলিমলিন দূর শিকড়ে
জাগে শিহরণ জাগে।
আগত আগত উদার সবিতা প্রাচী রঞ্জিত রাগে।
···
ললাট তোমার দিনের আশিষে দীপ্র
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিত হাস্য···

অফুরন্ত এ মধুপ্রপাত। মধুচ্ছন্দা উপাধির যোগ্য তিনি হয়েছেন প্রায়।

তাই আমার সন্দেহ হয় এই রাবীন্দ্রিক সহজ সহজিয়া পথ তিনি যেন

ইচ্ছা করে জোর করে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সরল সুলভকে পরিহার করে শুধু নয়, পদদলিত করে তিনি কঠোর কঠিনকে কর্কশকে পর্যন্ত বরণ করতে চেয়েছেন। স্বর্গের অনায়াস সৌন্দর্যের মধ্যে ভেসে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি পছন্দ করলেন নরকের দুর্গম সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে— ঊর্ধ্বের চেতনার অভিসারের চেয়ে অবচেতনার অভিযান তাঁকে প্রলুব্ধ করল। বস্তু হিসাবে শুধু নয়, কাব্যের গড়নেও তিনি চললেন কঠোরতার পথে— দান্তে যাকে বলেছেন Via selvaggia oscura (wild and obscure way)।

ম্যাথু আর্নল্ড কাব্যপ্রকৃতির দুটি ধারার মধ্যে পার্থক্য বেশ স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছিলেন ; তাদের নাম দিয়েছিলেন 'Pleasures of Poetry' আর 'Ardours of Poetry'— এ দুটি দিকই সুধীন্দ্র দত্তের মধ্যে কি রকমে টানাপোড়েন দিয়েছে তা বড়ই বিচিত্র। এ দিকটার কথা তবে একটু বলি এখন।

কবির মধুরেণ দিয়েই আরম্ভ করি। আগেই বলেছি :

আগত আগত উদার সবিতা প্রাচী রঞ্জিত রাগে···

আরো উল্লেখ করতে পারি :

বনবীথি জনশূন্য নিশীথে ;
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে ;
সুদূরের বাঁশি ডাকে অভিসারে ;
পিছনে কে চলে পা টিপে টিপে—

তখন কবিত্বের সংজ্ঞা যে দেওয়া হয়ে থাকে মাঝে মাঝে— গীতই কাব্যের আত্মা— সেই সূত্রের সম্যক পরিচয়, চমৎকার উদাহরণ পাই। তারপর যখন শুনি, পূর্বেই যে উদ্ধৃত করেছি :

উৎসুক প্রত্যাশা মোর শূন্য দিগন্তরে
নেহারে অস্থির মরীচিকা—

কিম্বা

অনুগ উত্তর হতে পলাতক দক্ষিণের কাছে—

তখন নূতন একটা কল্পনা, নূতন একটা ব্যঞ্জনা, নূতন একটা সুর এসে ধরা দেয় আমাদের অনুভবে— তখনো বলি বাঢ়ম্, এও রসাত্মকং বাক্যং।

অথবা আরো এগিয়ে চলে শুনি যখন :

ছুটেছে একাগ্র পথ, দুনিবার, নির্ভীক, উৎসুক

তখনো আমাদের কবিচিত্ত, রসলিপ্সু মন সমানে তৃপ্ত চমৎকৃত হয়ে চলে—আরো সম্মুখে :

লঙ্ঘি গিরি, অতিক্রমি নদী, দ্বিখণ্ডিত
করি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী, শত নগরীর
প্রলোভন উপেক্ষি—

পেগাসস্ (Pegasus) চলেছে যেন খরবেগে, উপলখণ্ড বিঘ্নিত করে, প্রতিধ্বনিত করে— এ পর্যন্ত বেশ আমরা কবির অনুপ্রেরণায় চলে গিয়েছি সুন্দর থেকে সুন্দরের মধ্যে, সুষ্ঠু থেকে সুষ্ঠুর মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ এর সঙ্গে শুনি কি কথা :

জাতিগত চেতনার
কুহেলীগুন্ঠিত প্রাগুষায়, স্বপ্নোত্থিত কৃষ্টি যবে
মৌন জিগীষায় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিরে চেয়েছিল
আয়ত্তে আনিতে, হানি তার নিষ্কবচ বুকে শেল,
গদা, পরশু, প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র, সেই
অক্ষত্রিয় বশীকরণের অলজ্জিত অভিজ্ঞান
এই রক্ত পথ, প্রগল্‌ভ প্রবাদ উৎকীর্ণ সকল
দেহে, কী ব'লে নিবিদে ?

তখন উপলখণ্ডে বিঘ্নিত ব্যাহত হয়ে পদস্খলন ঘটে না কি ? তারপর আরো দূরে এগিয়ে চলে যাই যদি কি শুনি, কি দেখি ?

অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্বঘটে ; এবং প্রৌঢ়ের কেন সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনি সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ—

এই দিক দিয়ে কবির :

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে ;
সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে ॥

অথবা

ব্যবধি বর্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ—
বলতে পারা যায় এতখানি মন্ত্রাত্মক বা সূত্রাত্মক হয়ে উঠেছে যে প্রায় ব্রহ্মসূত্রের বা মুগ্ধবোধের 'সর্ণেঘঃ'-এর পর্যায়ে পৌঁছেচে গিয়ে।

আমরা বহুদূরে সরে গিয়েছি আমাদের পরিচিত কাব্যশ্রী হতে। কবি যে কেবল লড়াইয়ে সমাজসংস্কারক, বিদ্রোহী রাষ্ট্রবিধায়ক, নাস্তিক কালাপাহাড় হয়ে উঠতে চলেছেন তা নয়, তাঁর শিল্পীহস্তের শালীনতা পর্যন্ত হারাতে বসেছেন। কালিদাসের যে শঙ্কা ছিল স্থূল-হস্ত-অবলেপের তারই চিহ্ন সব ছড়িয়ে পড়েনি? Ardours of Poetry -র কথা আমি পূর্বে যে বলেছি তা প্রকাশ পেয়েছে এক রকম চরম মাত্রায় (in excelsis)।

কিন্তু কবির, কবির অন্তঃপুরুষের এ কি মুখোস নয়, ছদ্মবেশ নয়? বলি না এ ছদ্মবেশের, এ মুখোসের সার্থকতা নাই।

সহজ আস্তিক্যবুদ্ধির পরিবর্তে মানুষ আজ চায় কণ্টকিত জিজ্ঞাসা, সুলভ হৃদয়ালুতার পরিবর্তে বাচনে ও ভাবনে একটা তপস্বীসুলভ রুক্ষতা। কাব্যে গীতের সুর চাই না, চাই সহজ প্রকৃতির চলন— পদ্য নয়, গদ্যের রীতিই দেবে কাব্যের কাঠামো; আধুনিকের এই যে বৃত্তি-বৈপরীত্য যদি শুধু হয় প্রতিবাদ, প্রতিপক্ষ— যদি না থাকে তার নিজস্ব একটা প্রত্যয় ও সত্য উপলব্ধি যা পক্ষাপক্ষের উর্ধ্বে— তবে তার সার্থকতা অতি সাময়িক মাত্র। আমরা তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি এই বর্তমান কবির অভাবাত্মক নয়, ভাবাত্মক উপলব্ধির কথা।

হৃদয়ের, অন্তর্হৃদয়ের পথে না চলে, চলে যদি একান্ত বুদ্ধির, বহির্বুদ্ধির পথে, তা হলে একটা নাস্তিকতার, বৈনাশিকতার দিকেই এগিয়ে যায় মানুষ। বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত ছিল যে একটা নাস্তিকতা বৈনাশিকতা, এমন কি শঙ্করাচার্যকে যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়, তার জন্য তাঁদের বিচার-বিতর্ক-প্রধান বুদ্ধি কতখানি দায়ী ছিল তা অনুধাবন করবার বিষয়। বিশেষতঃ কবির শিল্পীর পথে তাতে দারুণ ব্যাঘাতই এনে দেয়— প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্তি সে দিক দিয়ে হয় না। ফরাসী কবি ভালেরী, কি মালার্মে অবধি — যাঁদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ একটা সাজাত্য অনুভব করেন— তাঁরা ছিলেন বুদ্ধিভাবপ্রপীড়িত কবি। কাব্যের, বলতে পারি, কাব্য-পুরুষের দেহগঠনে

বুদ্ধির দৌলতে তাঁর মধ্যে এসেছে একটা সংহত সামর্থ্য, দৃঢ় সংস্থিতি, ওজঃশক্তি, বলিষ্ঠ মনস্বিতা— আমাদের বাংলা কাব্যে যার বিশেষ অভাব, রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও; কিন্তু হারিয়েছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত শ্রী। অবশ্য এখন আর বলা চলে না, এক সময়ে যেমন কেউ কেউ বলতে চেয়েছিলেন, যে বাংলার সনাতন কাব্যশ্রীর আদর্শ :

গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—

সে হল বৈষ্ণবী সহজিয়া রীতি, যার চিরকালের পরিচয়

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, ইত্যাদি

অথবা

প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতহি গাওত গীত—
ঝলকত ও মুখ-চন্দ
—গোবিন্দদাস

মধুসূদনী রীতিরও স্থান আছে বাংলা কাব্যে— মননশক্তি দিয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল করে তোলা যায় নিশ্চয়। কিন্তু তার সঙ্গে থাকা চাই বৈষ্ণবী-মায়ার কিছুটা— অন্তশ্চেতনার ছন্দ। সুধীন্দ্রনাথের কতখানি আছে এই বৈষ্ণবী-মায়া ?

বর্তমান যুগে কাব্যে মন্ত্রশক্তির কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। মন্ত্র হল সঞ্চারিণী বাক্ অর্থাৎ সুসংগীতি, সুসংহত, পরিস্ফুট, পরিপূর্ণ বাক্— তার মধ্যে যতখানি আলো, ততখানি শক্তি এবং ততখানি রসবত্তা। সুধীন্দ্রনাথ মনে হয় সজ্ঞানেই এই রকম একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত কিন্তু কার্যতঃ আলোর সঙ্গে বীর্যের, শ্রীর সঙ্গে সামর্থ্যের রাজযোটক দুর্লভ জিনিস— বিশেষতঃ আধুনিকের চেতনায়। প্রায় প্রথমে যখন সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন একটা তুলনা আমার অনুভবে এসেছিল— রবীন্দ্রনাথের মাধুর্য যদি হয় চিনির বা মিছরীর টুকরা তবে সুধীন্দ্রনাথের হল যষ্টী-মধু— অর্থাৎ তাতে কাষ্ঠের স্বাদ আছে কিন্তু সুমধুর রস নির্গত হয় কিছুক্ষণ কষ্ট করে চর্বণের ফলে। পূর্বে আমি বৃত্তি-বৈপরীত্যের উল্লেখ করেছি। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ

স্বভাবতঃই আলোময়, তাঁর চেতনা তাঁর জগৎ আলোময়, শ্রীময়; কিন্তু তাঁরও ছায়াময় দৃষ্টি, ছায়াময় জগৎ ছিল একটা, তা দেখা গিয়েছিল তাঁর চিত্রের জগতে। যুধিষ্ঠিরেরও নরক দর্শন, প্রেতলোক গমন হয়েছিল—এতে অসম্মানের কিছু নাই, বরং বিশিষ্ট সম্মানই আছে, তা পরে বলছি। ঠিক তারই বিপরীত হিসাবে বলতে পারি সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তভাবে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন একটা স্থূলতার, অসুন্দরের জগতের সঙ্গে, তাঁর বক্তব্য মানুষের অবর বা ইতর অর্ধের চেতনা নিয়ে—কিন্তু তারই পিছনে লুকিয়ে আছে, তারই জোরে জোর পেয়েছে এক ফল্গুধারা যা হল নব আস্তিকতা, নব আদর্শপ্রিয়তা—যার ফলে তিনি বলতে পেরেছেন, তাঁকে বলতে হয়েছে—আগ্নেয়গিরির অন্তর্দাহী গলিত ধাতু আর জ্বলন্ত দীপ্তি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে যেন :

নীরব নশ্বর যারা, অবজ্ঞেয় অকিঞ্চন যত
তাহারা আজিকে যেন লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা
আমার সঙ্কীর্ণ আত্মা অতিক্রমি দর্শনের সীমা
ছুটেছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গের মত

গভীর আন্তরিক আস্পৃহার পরিচয় নয় ?

অথবা

জ্যোতিঃস্রোতে
নামে দূর, দুর্নিরীক্ষ্য নীহারিকা হতে
তোমার আকাশবাণী, হৃদয়বেতারে
স্বতঃস্ফূর্ত অবেদ্য সঙ্গীত। বিজেতারে
খুঁজে পাই চেতনার অতলে অমনই ;
…মনোরথ
অবাধে সম্মুখে ছোটে, যেথা ভবিষ্যৎ
লব্ধকাম হেমন্তের সুবর্ণসম্ভারে

এই রকমে

তামসীরে ব্যক্ত করি, অমনই সুদূরে
তোমার চরণধ্বনি বাজে দিব্য সুরে॥

জগতের বর্তমান অবস্থা দেখে, মানুষের বর্তমান অবস্থা দেখে—হিটলার-

মুসোলিনী-মাড়োয়ারীর প্রতাপ দেখে—কবির চিত্ত বিকল হয়েছে আরো। তাঁর চেয়ে মহত্তর ব্যক্তিরও রূঢ় বাস্তবের সম্মুখে চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল—কিন্তু মৃত্যুর সাক্ষাতে বুদ্ধ পেয়েছিলেন বৈরাগ্য, বিদ্রোহের পরিবর্তে। এই ধরণের উপলব্ধি অনুভূতির ভিতর দিয়ে আর একজন মহামানব যে সত্য দর্শন করেছিলেন, এই মহাসমস্যার যে মীমাংসা দিয়েছিলেন, সে অমরবাণী আমাদের এনে দেয় যে আলো, যে আশ্বাস, যে তৃপ্তি—তাই আপনাদের কাছে কিছু পরিবেশন করি উপসংহারে। আধুনিক জগৎ নরকের মধ্যে এসে পড়ল কেন? কারণ সাবিত্রীর কবি বলছেন :

None can reach heaven who has not passed
through hell.[৪]

—*Savitri*

কিন্তু কেন? কারণ নরকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচে যে মানুষ সে দেখে সেখানে

He saw the secret key of Nature's change.
A light was with him, an invisible hand
Was laid upon the error and the pain
Till it became a quivering ecstasy,…
He imposed upon dark atom and dumb mass
The diamond script of the Imperishable.[৫]

—*Savitri*

নরকের মধ্যে আসা দরকার হয়েছিল নরককেই উদ্ধার করতে, নরকের রূপান্তর সাধন করতে এবং মানুষকেও এইভাবে দেবতাদের চেয়েও মহত্তর করে ধরতে।

৪ নরকের ভিতর দিয়ে যে চলে আসেনি
সে কখন স্বর্গে পৌঁছিতে পারে না।

৫ প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়, তার গুপ্তরহস্য সে দেখল,
সঙ্গে নিয়ে চলল মহাজ্যোতিকে
অদৃশ্য স্পর্শ এক লাগল গিয়ে ভ্রান্তির আর বেদনার উপর,
তা হয়ে উঠল তীব্র আনন্দের স্পন্দ—
অন্ধ অণুকণা আর মূক কলেবরের উপর
সবলে এঁকে দিল অক্ষয়ের অগ্নি-অক্ষর।

I know there shall inform the inconscient cells,
At one with Nature and at height with heaven,
A Spirit vast as the containing sky
And swept with ecstasy from invisible founts,
A god came down and greater by the fall.[৬]

—*Savitri*

আমি জানি অচেতন দেহকোষ এক দিকে প্রকৃতি আর ঊর্ধ্বে
স্বর্গের সঙ্গে এক হয়ে যাবে,
তার মধ্যে জেগে উঠবে অধ্যাত্ম-পুরুষ ;
সর্বব্যাপী আকাশের মত সব ছেয়ে,
অদৃশ্য উৎসের পরমানন্দে আপ্লুত হয়ে,
নেমে এল দেবতা, পতনের কল্যাণেই যে হয়ে উঠল মহত্তর ।

হাফিজের একটি রুবাই

হাফিজের একটি রুবাই[১] কবি নজরুল এইভাবে অনুবাদ করেছেন :

কালের মাতা দুনিয়া হ'তে,
পুত্র, হৃদয় ফিরিয়ে নে তোর।
যুক্ত ক'রে দে রে উহার
স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ওর।
হৃদয় রে তুই হাফিজ সম
হ'স যদি ওর গন্ধ-লোভী,
তুইও হবি কথায় কথায়
দোষগ্রাহী, অমনি কঠোর !

তবে নজরুল বলছেন তিনি এর কিছুই বুঝতে পারলেন না— হেঁয়ালী বা প্রলাপ বলে এটিকে বাদ দিতে চেয়েছেন প্রক্ষিপ্ত হিসাবে। আমাদের কাছে কিন্তু মোটেও অবোধ্য বা হেঁয়ালী মনে হল না কথা কটি। স্মরণে রাখা দরকার হাফিজ কেবল সরাব-সাকীর উপাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরো অনেক পারস্য কবিদের মত সুফী-সাধক— সুফী সাধু-সন্তদের হাবভাব সিদ্ধান্ত তাঁর কাব্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। হাফিজ কি বলতে চান, এবার কিছু বুঝতে চেষ্টা করি।

প্রথমত, কবিতাটি আরো মূল-অনুসরণে তর্জমা করলে দাঁড়ায় এই রকম (আমার এক পারস্য ভাষা ও সাহিত্য -বিশারদ পণ্ডিতবন্ধু বলছেন):

ওরে দিল্, দিল্ তোর ফিরিয়ে নে দুনিয়া-মায়ের কাছ থেকে—
তার খসমের যে শেষ অর্ধেক তারি সঙ্গে এক হয়ে যা।
দিল্, তুই যদি প্রিয়ের সৌরভে হাফিজের মতো আনন্দে
মাতোয়ারা হয়ে যাস, তা হলে হাফিজের মতোই তুই হবি
হুঁসিয়ার সমঝদার।

১ 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন —শুনলাম

দুনিয়া বা জগতের স্বামী হলেন ভগবান— তাঁর দুই মূর্তি, সব শাস্ত্রই বলে, পরা-অপরা, দক্ষিণা-বামা, লৌকিক-অলৌকিক অর্থাৎ উপরের-নীচের। মানুষ আসক্ত ভগবানের প্রথম রূপে, নিম্নতর ব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে সাধারণ অজ্ঞানময় জীবনে। কবি বলছেন মানুষকে এই এখান থেকে তুলে নিয়ে ভগবানের উত্তর রূপে, ঊর্ধ্বতর জ্যোতির্ময় সত্তায় তার ভালবাসা স্থাপন করতে হবে। তার ফল কি? হাফিজের মতো পরম আনন্দে বিভোর হয়ে যেতে হয়। সে আনন্দ যে পেয়েছে তার কাছে আর-সব আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। তার রুচি হয়ে ওঠে এমন তীক্ষ্ণ মার্জিত, তার তৃপ্তি ঐ এক বস্তু ছাড়া আর কিছুতে হয় না। এই দিক দিয়ে যদি দেখি, মনে রাখি এ কটি কথা, তবে নজরুল যে-ভাবে অনুবাদ করেছেন তারও একটা সদর্থ পাই।

শেক্সপীয়রিয়ানা

সিনেমায় সেদিন দেখলাম 'জুলিয়স সীজর'— নূতন করে তাই এই শেক্সপীয়র-জিজ্ঞাসা। প্রথমত মনে হল হিংসা অর্থাৎ হিংস্রতা (violence) সুফল কখন আনে না— তার পিছনে সদ্‌বুদ্ধি সদুদ্দেশ্য থাকলেও— তা আনে কেবল বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা বিনষ্টি। বৃত্তিটি গর্হিত অর্থাৎ অসাধু নীতিবিরুদ্ধ, মানবতার পরিপন্থী বলে যে এরকম ঘটে তা নয়— হয় প্রকৃতিরই একটা নিয়মের, প্রায় অচেতন যান্ত্রিক-নিয়মের ফলে, যাকে বলা হয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম। জোর-জবরদস্তি করে যে কাজ কর এবং যতটা জোর-জবরদস্তি করে, ঠিক ততটা জোরে তোমার উপর সে এসে পড়ে— বুমেরাং যে রকম। গ্রীক ট্রাজেডিতে এই সত্যের প্রতীক হলেন দেবী এটি (ATE), শেক্সপীয়র নিজেই বলেছেন যেমন (আন্তনীর মুখ দিয়ে):

And Cæsar's spirit ranging for revenge,
With Ate by side come hot from hell.

অর্থাৎ এ হল আমরা যাকে বলি কর্মফল— উৎকট কর্মফল, তারই চিত্র ট্রাজেডি। উৎকট কর্ম কাকে বলি? তীব্র দুষ্প্রবৃত্তি। দুষ্প্রবৃত্তি কি? কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই পরিচিত ষড়রিপুর নিরঙ্কুশ আবেগ। মানুষের অসংযত রাজসিক ও তামসিক প্রাণবৃত্তি। আর এদের প্রভু 'অহং'। অহম্মন্যতাই নিয়ে আসে অ-সাম্য। সৃষ্টিতে সমাজে গোষ্ঠীজীবনে প্রয়োজন যে অন্যোন্যাশ্রয়, পারম্পর্য, সঙ্গতি তাকে বিকল করে, ভেঙে দেয় এই অহংয়ের একদেশদর্শিতা। যা হোক, সে দার্শনিক তত্ত্বের কথা আমরা এখানে বিচার করছি না— আমরা বলছি তার ফলের কথা।

এই যে উৎকট কর্ম তার প্রথম ফল অবশ্য কর্মীর নিজের উপর। যে-কর্মী স্পষ্টই 'অয়মহং ভোঃ'-র প্রতীক, তার সম্বন্ধে ত কোন প্রশ্নই নাই। যে অহং-অজগর চায় আত্মপূর্তি, পরকে দংশন করে ভক্ষণ করে— নিজের বিষে কি রকমে সে নিজে ক্রমে জর্জরিত হয়ে ওঠে— পরকে ভক্ষণ করতে করতে নিজেকেই ভক্ষণ করে চলে সমানে, তার চিত্র চমৎকার দিয়েছেন শেক্সপীয়র

তাঁর ম্যাকবেথ ও লীয়রে। ওথেলো মনে হতে পারে ভিন্ন রকমের— তাঁর দুষ্কর্ম কি? শুধু কি

…Loved not wisely, but too well—

তাঁর প্রেমে আত্মদান নাই, আছে আত্মতর্পণ, ঈর্ষীর ক্ষুধিতের অধিকার-স্পৃহা। তাঁর প্রেমাবেগ মনে হয় যেন কৃষ্ণবর্ণ গলিত ধাতুস্রাব— তাঁর নিভৃত প্রকৃতির পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর শেষ চরম উগ্রতাপূর্ণ কথায়:

I took by the throat the circumcised dog
And smote him, thus.

ন্যায়সঙ্গত পরিণতি নয় ঐ রকম ধাতুর মানুষটির?

জুলিয়স সীজর আমাদের নিয়ে যায় যেন আর একটু উপরের স্তরে। বৃত্তিটি— উৎকট কর্মটি এখানে ঠিক রাজসিক বা তামসিক স্তরে নয়, তাকে তুলে ধরা হয়েছে বা ঢেকে রাখা হয়েছে একটা সাত্ত্বিকতার পর্যায়ে— আদর্শের সেবক যাঁরা, উচ্চতর মহত্তর লক্ষ্য অনুসরণ করেন যাঁরা, অহং-সেবা নয়, যাঁরা চান দেশ-সেবা জন-সেবা মানবজাতি-সেবা— সীজর বা ব্রুটস এই জাতীয় বিভূতি। কিন্তু সাত্ত্বিক অহংকারও কি কম রুদ্র, কম নিদারুণ নির্মম— উৎকট হয়? অপরের জনসঙ্ঘের দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে— যাকে সে মঙ্গল মনে করে— তাদের উৎসন্ন দিতে, একটা সর্বগ্রাসী ধ্বংস সাধন করতেও বাধে না। সীজর বলছেন যখন:

Know, Cæsar doth not wrong

বলছেন আরো:

I do know but one
That unassailable holds on his rank,
Unshaked of motion: and that I am he…

সাত্ত্বিক খোলসের ভিতর দিয়ে কি 'অয়মহং' ফেটে পড়ছে!

অথবা ব্রুটস, যাকে সকলে মনে করে, নিজেও যিনি মনে করেন হলেন মহানুভব উদ্ধারক দুষ্কৃত-বিনাশক, বলছেন যখন:

As he was ambitious I slew him—

এ অহমিকা মানুষের চোখে ধূলা দিতে পারে কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাকৃত শক্তি-ধারাকে ভুলাতে পারে না— যে কর্মধারা এই চেতনা থেকে প্রবর্তিত হয় তা

ক্রমে উত্তাল আবিল প্লাবনে পরিণত হয়, সীমানার মধ্যে বা মানস ঔচিত্য-বোধের মধ্যে তার ধ্বংসক্রিয়াকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না।

গ্রীক চেতনায় কর্মগতি ও কর্মফল একটু ভিন্ন রূপ পেয়েছে ; ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বাধীন প্রবৃত্তি সেখানে কর্মের গুণ (দোষ) নির্ধারণ করে নাই। সেখানে কর্ম হয়েছে নির্ব্যক্তিক, সামাজিক, বা (তাদের মতে) দিব্য-বিধানের প্রতিক্রিয়া যেন। 'মিডিয়া'-র কর্ম অবশ্য ব্যক্তিগত স্বনিয়ন্ত্রিত এবং তার নিজের দিক দিয়েই ঘোর কর্ম। কিন্তু রাজা ইডিপস নিজে ত ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ ও অজ্ঞ— তাকে দিয়ে যে কর্ম করান হয়েছে তা হল বিধিবিরুদ্ধ এবং মানবিক প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত অজ্ঞতা, নিজস্ব অন্তরের নির্দোষিতা অপকর্মকে নিষ্ফল করতে পারে না, কার্যত যা অপকর্ম তা অপকর্মই।

শেক্সপীয়র এই জিনিসটিকেই সুন্দর ব্যাখ্যাত করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'more sinned against than sinning' বাক্যটিতে। দুষ্কর্মের, উৎকট কর্মের প্রকৃতিই হল দোষীকে শুধু নয়, কেবল সাহায্যকারীকেও নয়, অনেক সম্পূর্ণ নির্দোষীকেও, পুণ্যবানকে পর্যন্ত, টেনে নিয়ে যায় একই প্রায়শ্চিত্তের বা বিনষ্টির মধ্যে। ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তি বা দুষ্কর্ম ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো, আগুন প্লাবন ঝড়ঝঞ্ঝার সংক্রামক ব্যাধির মতো। চোর ডাকাতের সঙ্গে কত নিরীহ সজ্জনও হয় সেখানে বিক্ষত বিনষ্ট। সৃষ্টি হল সবটা মিলে একটা গোটা জিনিস— সব পরস্পরে সংযুক্ত। ব্রুটসের সঙ্গে পোরসিয়া, হ্যামলেটের সঙ্গে ওফেলিয়া, ওথেলোর সঙ্গে ডেসডিমোনা, লিয়রের সঙ্গে কর্ডেলিয়া একই ভাগ্য নিয়ে যেন তলিয়ে গেল। ট্রাজেডির শেষে বেঁচেবর্তে রইল যারা তা যেন তাদের নিজের গুণে, সুকর্মের ফলে নয়— তা নেহাৎ আকস্মিক ও অহেতুক ব্যাপারই।

২

শেক্সপীয়রের যবনিকা অপরূপ বস্তু— বিকট একটা ঝড়ের পরে সব শান্ত সব পরিষ্কার। সত্যসত্যই মনে হয়, মনে হয় শুধু নয়, অনুভব হয় :

After life's fitful fever he sleeps well.

প্রাণ বলে ওঠে যেন, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শেক্সপীয়রের আরম্ভ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমরা জানি। তিনি সূত্রপাত করেন কাহিনীর একেবারে মাঝখান থেকে (in medias res)— গল্পের ঐতিহাসিক আরম্ভ জানান হয় একটা, আজকাল সিনেমার ভাষায় যাকে আমরা বলি flash-back তা দিয়ে। আরম্ভেও শান্ত ভাব, আপাতপ্রতীয়মান শান্তি, দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ যে শান্তি, গুরুভারাক্রান্ত শান্তি— মুক্ততার প্রসন্ন শান্তি নয়। স্মরণ করুন হ্যামলেটের আরম্ভ :

Zounds, who's there ?···

Not a mouse stirring—

একটা বিপ্লব বিপর্যয়ের পূর্বাভাস— তড়িৎ-তেজ— আকাশ বাতাস ভরে দিয়েছে। যুযুৎসু সব শক্তিরা ক্রমে জমায়েৎ হয়ে আসছে রণাঙ্গনে। মেঘ সাজছে, দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে গেল, উঠল তুমুল ঝড়, তুফান— হল ভরাডুবি। কিন্তু তারপর— শেষে ? উত্তাল বিক্ষুব্ধ সাগর তার প্রমত্ত ক্ষুধা মিটিয়েছে— এখন মুখে তার শান্তি, সহাস্য সূর্যকিরণোদ্ভাসিত। দুর্ঘটনা শোকদৃশ্য অতীতের স্মৃতিরূপে থেকে যায়, রেখে যায় কারুণ্যের কেমন একটা মধুর রেশ। যে দারুণ কাহিনী ঘটনাবলি আমাদের চেতনার রঙ্গমঞ্চ জুড়ে ছিল, দেখা দিয়েছিল তার সর্বগ্রাসী অতিকায় রূপে, যাকে মনে হয়েছিল একমাত্র সত্য বা বাস্তব সৃষ্টির মধ্যে, তাকে এখন বিশ্বনাট্যের মধ্যে ধরে দেখান হল, বিশ্বপটে একটা অতি সামান্য অংশ তার। যতই তা করুণ হোক না, বিশ্ব তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে অনেকখানি, তার প্রাধান্য তেমন নয় যেমন মনে হয়েছিল অভিভূত চেতনায়। একটা বিশেষ পরিস্থিতির যে মর্মন্তুদ বেদনা (যাকে বলি ট্রাজেডি) তাকে সহজ করে সহনীয় করে মোলায়েম করে— প্রায় মুছে দিয়েই যায়—একটা উদারতর হস্তের স্নেহপ্রলেপ, চারদিক-কার অকিঞ্চিৎকর দৈনন্দিন নিত্যপরিচিত অনিবার্য ঘটনাবলির যেন যাদুস্পর্শ। বিশ্বপ্রকৃতির কোল থেকে হঠাৎ যেন উপস্থিত হয় ছোট একটি পরী, তার তারল্য ছড়িয়ে দিয়ে সে বলে যেন, 'আমিও আছি— কেবল শয়তান নয়'। এই যে তাঁর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের শেক্সপীয়র মনে হয় তিনি তাঁর সর্বশেষ নাটকখানিতে (Tempest-কেই অনেকে বিবেচনা করেন সর্বশেষ গ্রন্থ) রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর শেষের রহস্যটিকে। গভীরতর অর্থে এই হল ট্রাজেডির দান বা সার্থকতা— পরিশুদ্ধি (katharsis)।

৩

শেক্সপীয়র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁর ভাষা সম্বন্ধে কিছু না বলে থাকা যায় না। এই ভাষার যাদু সর্বজনবিদিত সর্বজন-আদৃত। এমন জীবন্ত প্রাণবন্ত ভাষা আর কারো হাতে এসেছিল কি না সন্দেহ। মনে হয় ছুরি দিয়ে আঁচড় দাও যদি কোথাও এর অমনি তাজা রক্ত ঝরতে থাকবে। কি রঙে কি আলোয় ভরা সে রক্তধারা। তাই ত বলা হয় প্রকৃতি স্বয়ং যেন শেক্সপীয়রের হাত দিয়ে লিখে গিয়েছেন এ ভাষা, মানুষ বা লেখক শেক্সপীয়র নয়।

আজ আমি এখানে শেক্সপীয়রের ভাষার একটা দিক দেখাব—কারণ তাঁর বৈভব প্রায় ঐশ্বরিক বৈভব,— কালিদাসের কথায় তা হল বিষ্ণু যেমন সাগরের মতই 'অনবধারণীয়', বলা যায় না তা এতখানি বা এই রকমের :

অনবধারণীয়মিদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা।

শেক্সপীয়রীয় বাক্যরীতি (স্টাইল) তিন ধরণের আমরা দেখতে পাই এবং তা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থান-বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত লক্ষ্য করি একটা জটিল দীর্ঘ-এলায়িত উচ্ছ্বসিত অসংহত লীলাভঙ্গ। উদাহরণ বিখ্যাত হ্যামলেটীয় ভাষণ :

Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take up arms against a sea of troubles,···

এই বাগ্‌বৈখরীর বিরুদ্ধে অনেক ন্যায়াধীশ সমালোচকের বাক্যবাণ বর্ষিত হয়েছে, বর্ষিত হয়েছে এর অসংলগ্নতার অত্যুক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু তবু সাহিত্যে এ বস্তু টিঁকে আছে তার নিজস্ব সার্থকতায় ও গৌরবে। প্রথমত এ রীতিতে প্রতিফলিত হ্যামলেট-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য— হ্যামলেট জটিল চরিত্র, কবির্মনীষীর চরিত্র, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি -বৈচিত্র্যের যুগপৎ আত্মপ্রকাশ-প্রচেষ্টা। ম্যাকবেথের :

If it were done when 'tis done, then 'twere well—

ইত্যাদি এই একই রীতির পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়ত, তাতে আবার এলিজাবেথীয় যুগধর্মেরই স্বভাব প্রতিফলিত। ন্যায়শাস্ত্রাতিরিক্ত, তর্কবুদ্ধিবিমুক্ত একটা ভাবগাঢ় চিন্তাস্রোতের প্রখর উদার ছন্দায়িত গতি শেক্সপীয়রীয় যাদুর

এক বৈশিষ্ট্য। শেক্সপীয়রের দ্বিতীয় রীতি হল ঠিক এই ন্যায়শাস্ত্রানুগ ক্লাসিকাল ভঙ্গী। সেখানে কথা সব ওজন করে এবং ভারী ভারী কথা চয়ন করে, সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দরগঠন ইমারত তৈরী হয়েছে যেন। শুনুন সীজরেরই নিজের কথা:

If I could pray to move, prayers would move me :
But I am constant as the northern star,
Of whose true fix'd and resting quality
There is no fellow in the firmament.
The skies are painted with unnumber'd sparks···

এ হল যাকে বলা চলে rhetoric in excelsis— পরিচ্ছিন্ন সুগঠিত সংহত চিন্তাভূয়িষ্ঠ বাক্‌শ্রেণী। অবশ্য পাগল লীয়র যে বাক্‌সমারোহ সাজিয়ে তুলেছেন তার ধ্বনি-গৌরব, ছন্দায়িত তরঙ্গ-দোল মিলটনকেও হারিয়ে দেয়:

You cataracts and hurricanes, spout
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt couriers of oak-cleaving thunderbolts,···

অথবা স্মরণ করতে পারি বহ্বাক্ষর গুরুভার

The multitudinous seas incarnadine —*Macbeth.*

শেষত, শেক্সপীয়র হতে পারেন অতি সহজ, অতি সরল, নিরাভরণ অনাবৃত আন্তরিক— প্রগল্‌ভতা নয়, চাতুর্য নয়, সেখানে ধরা দিয়েছে কুমারীর দেহের তন্বী শ্রী— যদিও তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে পরিণত চেতনার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, এই যেমন বর্তমান নাটকখানির মধ্যেই পাই:

Time is come round
And where I did begin, there shall I end.

তাই বলতে ইচ্ছা হয় শেক্সপীয়র কবি নন, তিনি হলেন যাদুকর— কথা দিয়ে এমন ভেল্কী খেলেন যে তার তুলনা নাই। কথায় যা নাই, তিনি কথার মধ্যে তা ভরে দেন, দেন এমন একটা সুর ও ছন্দ এমন একটা অনুভূতি-চমৎকারিত্ব যে তা হয়ে ওঠে এক অপরূপ সৃষ্টি। ধরুন না সেই অতিপরিচিত লাইন কটি— কবিত্বের রস-সার বলা যেতে পারে:

daffodils

That come before the swallow dares, and take

The winds of March with beauty…

কিম্বা

In such a night

Stood Dido with a willow in her hand

Upon the wild sea-banks, and waft her love

To come back to Carthage.

যেখানে লাইন তিনেকের মধ্যে Virgil-এর প্রায় একটা সমগ্র সর্গের করুণ কাহিনী ভরে দিয়েছেন।

আরো

Look how the floor of heaven

Is thick inlaid with patines of bright gold—

বিনা কারণেই কি অপণ্ডিত সাধারণ পাঠকেরা বলে ওঠে— শেক্সপীয়র? ও ত শুধু উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ!

জীবন-নাট্য

শেক্সপীয়র মানুষের জীবনধারার যে সাত অবস্থা বা দুরবস্থার কথা বলে গিয়েছেন তা আমাদের পরিচিত :

All the world's a stage,
And all the men and women merely players ;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms. ···

··· ··· ···

Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness, and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

—*As You Like It*

তাঁর যুগের তাঁর দেশের জীবনধারা এঁকেছেন শ্লেষে, ব্যঙ্গে, রোষে, ক্ষোভে, হাস্যে, কৌতুকে, সমুজ্জ্বল ভাষায়, কিন্তু মূল বক্তব্য সার্বভৌম সত্য বলেই প্রতিপন্ন করিয়েছেন। করুণ চিত্র, নিরাশার চিত্র, ব্যর্থতার নিরর্থকতার মহাশূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস রয়েছে শেষে, 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পাগলের মত বলছে সকলে যেন 'সব ঝুটা হ্যায়, ঝুটা হ্যায়'। শেক্সপীয়র নিজেও অন্যত্র অন্যভাবে দিয়েছেন ট্রাজিকের কঠোর নির্মম স্বল্পবাক্ ভঙ্গিতে ঐ একই সিদ্ধান্ত :

It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing. —*Macbeth*

হয়ত তিনি নূতন কিছু বলেন নি, বাইবেলের প্রাচীন নবী যে দৃষ্টি নিয়ে বলে গিয়েছেন :

vanitas vanitatum—

(Vanity of vanities, all is vanity)

তারই ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিয়েছেন তিনি।

আমাদের দেশেও এ দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রতুল নয়। মায়াবাদী বা বৌদ্ধপন্থীরা সেই একই স্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে ধরেন— শঙ্করাচার্য (বা তদনুরাগী কেউ) যখন বলছেন :

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ—

তখন সাত অবস্থা বা বয়ঃক্রমের পরিবর্তে চারটির কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু জীবনের ধারা তাতে একই রয়ে গিয়েছে। সেই একই নৈরাশ্যের ব্যর্থতার ক্রম। তবে এখানে নূতন তথ্য একটা সংযোগ করা হয়েছে, উদ্ধারের নিস্তারের একটা ইঙ্গিত; সার্থকতার একটা উপায় 'ব্রহ্মণি' উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কার্যতঃ সেটিও নিষ্ফল।

মানুষের দৃষ্টি, ভাব-ভঙ্গি চিরকালই যে এ রকম ছিল তা বলা মানুষকে অত্যধিক ঘৃণা করা— শেক্সপীয়রের টাইমনের (Timon of Athens) চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখা। কিন্তু অন্য রকমের যুগ ছিল, অন্য ধরণের মানুষেরও স্থান ছিল পার্থিব সমাজে— একটা বীরভাবেব যুগ, বীরভাবের মানুষ, তারা জগৎকে স্থির-দৃষ্টিতে দেখত, বিচলিত হত না, তা থেকে তার পূর্ণ সার্থকতাও সংগ্রহ করতে পারত। মহাকবি কালিদাস লোকোত্তর সত্তাদের জীবন-ধারা বিবৃত করেছেন, তার মধ্যে একটা ক্রমবিভাগ দেখিয়ে তিনিও বলেছেন অবস্থা-চতুষ্টয়ের কথা। রঘুবংশীয়দের ধর্মকর্ম জীবন-ধারা এই রকমের :

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং—

শৈশবে তাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন— যৌবনে বৈষয়িক অর্থাৎ সাংসারিক সামাজিক করণীয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। বার্ধক্যে বিষয়-বিরত হয়ে একটা আন্তর-সাধনার জীবন যাপন করতেন। এবং পরিশেষে সময় হলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন যোগস্থ হয়ে।

জীবনের ট্রাজেডিকে এভাবে বরণীয় এবং রমণীয় করে তোলবার কৌশল কি সুন্দর দেখান হয়েছে। শেক্সপীয়র হতে বহুদূরে চলে এসেছি আমরা। ইউরোপেও প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস তাঁর জীবনে এই সাধনার পরিচয় কিছু দিয়েছিলেন।

কালিদাস অবশ্য ভারতীয় জীবন-দর্শনই অনুসরণ করেছেন। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় যে আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত আছে কালিদাস সেই একই জিনিস দিয়েছেন—১. ব্রহ্মচর্য ২. গার্হস্থ্য ৩. বানপ্রস্থ ৪. সন্ন্যাস। এ জীবন-দর্শন জীবনকে মায়া মোহ মিথ্যা নিরর্থক বলে নাই—জীবনকে ব্যবহার করেছে, অনুগত করেছে একটা জীবনাতীত সত্যের কাছে; নশ্বর অর্থ বিভীষিকা মরীচিকা নয়। তা হল ইতিমধ্যস্থ সত্য এবং তার সার্থকতা শাশ্বতের সহায় ও উপায় হয়ে।

প্রাচীনতর এক যুগে এই বৃহত্তর দৃষ্টি ছিল বলেই জীবন তখনও শেক্সপীয়রীয় করুণ প্রহসন হয়ে ওঠেনি। জীবনের নশ্বরতা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বস্তু, কিন্তু তাতে শোকাচ্ছন্ন বিমূঢ় না হয়ে, শান্ত প্রসন্ন চিত্তে তাকে বরণ করা যেতে পারে। উপনিষদের ঋষি যখন বলছেন: শস্যমিব পচ্যতে লোকঃ শস্যমিব আজায়তে পুনঃ—শস্যের মতই জীব পেকে ঝরে যায়, আবার শস্যের মতই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; জীবনের জন্মের অনন্ত আবর্তন দেখছেন ঋষি এখানে—এক প্রশান্ত দৃষ্টি, উদাসীন ও উর্ধ্বাসীন চেতনার পরিচয় পাই; তার স্পর্শে এই নশ্বর পরিবর্তনশীলতার অন্তরে যে একটা কারুণ্য আছে—ভার্জিলের বিখ্যাত কথা:

SUNT LACRYMAE RERUM MENTEM MORTALIA TANGUNT

মরতার মধ্যে লুকিয়ে যত অশ্রু,—আমাদের প্রাণকে তা স্পর্শ করে, তার গুরুভার যেন লাঘব হয়ে আসে,—নির্মল, প্রায় সহাস্য দৃষ্টিতেই তাকে দেখতে শিখি।

ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তই পুনরুক্তি করেছেন আবার শ্রীকৃষ্ণ, তবে তাঁর পাঞ্চজন্য বাজিয়ে:

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

হে ভরত-বংশধর! জীব আদিতে থাকে অপ্রকাশ, মাঝখানে হয় তার

প্রকাশ, অন্তে আবার অপ্রকাশ হয়ে যায়— এর জন্যে আবার শোক কি? শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শোক দুঃখ করবার কোন অবসর দেন নাই, বলা বাহুল্য। তবুও অন্তর্যামী ভগবান যিনি মানুষের দুর্বলতা তিনি জানেন ও বোধ করেন, নতুবা অর্জুনের সখা হবেন কি রকমে। সব আশা ভরসা উৎসাহ দিয়ে এবং জ্ঞানের কথা সব বলে শেষে উত্তম রহস্য দিয়েছেন এইভাবে— আমি জানি জগৎটা অনিত্য এবং সুখহীন (ব্রহ্ম-সাধনাও সহজ নয়), সুতরাং তুমি আমাকে ভালবাস, আমার আশ্রয় গ্রহণ কর— আমি তোমারই মতো মানুষ, মানুষ-ভগবান, পরম প্রেমাস্পদ।

যা হোক, জীবনের কর্মচক্রে অভিভূত পিষ্ট না হয়ে, এইভাবে তাকে অতিক্রম করবার অর্থাৎ এড়িয়ে যাবার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তবুও ধর্মচক্রটি নিজে স্বরূপতঃ যা আছে তাই থাকে চিরকাল। জীবন হ'ল মৃত্যু-অভিসার, এর ব্যতিক্রম নাই। বৈজ্ঞানিকের এই যে second law of Thermodynamics— শক্তির অনিবার্য ক্রমক্ষয়, অকাট্য নিয়ম তা, সনাতন বিধিলিপি। কিন্তু নিয়তির লৌহবিধিকে ভাঙবার, ভেঙে নূতন করে গড়বার স্বপ্নও ত মানুষে দেখছে? এটি হয়ত বিশেষভাবে আধুনিক প্রাণের কথা। জীবনের মধ্য দিয়ে চলেছে একটা আশা ও ভরসার অভিব্যক্তি এবং পরিণামে রয়েছে একটা পূর্ণসার্থক পরিণতি। ইংরেজ কবি ইয়েট্‌স্ এই রকম একটা লক্ষ্যের কথা বলেছেন— তিনি বলেছেন মানব-জীবন আরম্ভ একটা বিজয় দিয়ে, তারপর বিভিন্ন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে শেষও করেছে একটা বিজয় দিয়ে। ঐহিক জীবন একটা সঙ্কুল যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথম বয়সে, জাতি হিসাবে হোক আর ব্যক্তি হিসাবে হোক, মানুষের লড়াই তার দেহের সঙ্গে— শিশুর চেষ্টা পায়ে ভর করে দাঁড়ান, খাড়া হয়ে ওঠা; আদিম মানুষেরও সেই প্রয়াস, বানরের ন্যুব্জ দেহ সে ঋজু করে তুলতে চেয়েছে— শুধু তাই নয়, তার বিরোধী কঠোর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজের জন্য স্থান ও স্থিতি করে নিয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে স্থুল প্রতিষ্ঠা লাভ এই প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয় লড়াই যৌবনে— তার প্রাণের বাসনার আবেগের সঙ্গে, যখন তাকে পেয়ে বসেছে আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতালোভ, প্রেম-লিপ্সা, বিজিগীষা (Love

and War)। হৃদয়ের রাজ্য তার সমৃদ্ধ হল, কিন্তু হারাল সে তার শৈশবের নির্মল সারল্য,— অজ্ঞানতা যদিও তা।

এই জ্ঞানের জন্য লড়াই তার পরিণত বয়সে— প্রাণের স্তরের উপরে উঠে সে চেয়েছে মন-বুদ্ধির রাজ্য। মানুষ হয়ে উঠল জিজ্ঞাসু, তার্কিক— কিন্তু সন্দেহ-সমাকুল। কোথায় রইল তার যৌবনের দৃপ্ত বিশ্বাস, আত্মগৌরব ?

কিন্তু ভয় নাই। রাত্রির অন্ধকার যখন একেবারে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক তখনই তার শেষ বিজয়— আত্মার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার।

প্রথমে দেহ, তারপর প্রাণ, তারপর মন, তারপর আত্মা, মানবচেতনার ক্রমোত্তরণে এই পাদচতুষ্টয়।

He with the body waged a fight,
But body won ; it walks upright.

Then he struggled with the heart ;
Innocence and peace depart.

Then he struggled with the mind ;
His proud heart he left behind.

Now his wars on God begin ;
At stroke of midnight God shall win.

—The Four Ages of Man : W.B. Yeats

কিন্তু এই যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার যার অর্থই শান্তির স্বস্তির মুক্তির অমৃতত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তার জন্যে ওপরে চলে যাওয়ার দরকারও নাই —এখানেই ও-সব হতে পারে পূর্ণমাত্রায়, এই দেহ-প্রাণ-মনই হয়ে উঠতে পারে ভগবানের প্রতিমূর্তি। আধুনিক ঋষিদৃষ্টি বলছে তাই :

Annulling the decree of death and pain
Erasing the formulas of the Ignorance···
Nature shall draw back from mortality
And Spirit's fires shall guide the earth's blind force.

—*Savitri*